আনন্দমেলা
১২ সেপ্টেম্বর
আনন্দবাজার-প্রকাশন

আনন্দমেলা

তোমাদের মনের মত রঙীন পূজাবার্ষিকী

উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়ের
সুবিশাল শঙ্কু-কাহিনী ছাড়াও
আশাপূর্ণা দেবী
সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
শৈলেন ঘোষ

বড় গল্প

সুবোধ ঘোষ
বিমল মিত্র
শংকর

অবনীন্দ্রনাথ ও সুনির্মল বসুর
অপ্রকাশিত রচনা

গল্প

মনোজ বসু
লীলা মজুমদার, জরাসন্ধ
সন্তোষকুমার ঘোষ, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব গুহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শেখর বসু, নবনীতা দেবসেন
তারাপদ রায় ও আরো অনেকে

ভ্রমণ কাহিনী

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ছড়া

অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র
অরুণকুমার সরকার, শঙ্খ ঘোষ
শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
ও আরো অনেকে

পরীক্ষার্থীদের জন্য

হেড এগজামিনারের লেখা
'কী করে নম্বর বাড়াতে হয়'

এছাড়া দু দু'টি চিত্রকাহিনী ও আরো লেখা, ধাঁধা, কমিক্স, ম্যাজিক, ছবি ও অনেক অনেক মজা

১২.০০/রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪.৭০

তোমার কপির জন্য লেখ: সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০১

AAM/CAS-10/79 BEN

আনন্দমেলা

২৬ ভাদ্র ১৩৮৬ • ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ • ৭ বর্ষ • ৮ সংখ্যা

গল্প
ম্যাজিশিয়ান। বিমল কর ৮
যেন রূপকথা। কবিতা সিংহ ৩২
টুপুর দুপুর। তৃপ্তি রায় ৪৪
উপন্যাস
কে। বিমল মিত্র ১৪
পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭
বিশেষ রচনা
জাপানি পুতুলের আসরে। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। অভিষেক দাস ৬২
আত্মকথা
খেলতে-খেলতে। চুনী গোস্বামী ৩৬
ছড়া
তাল-বেতাল। বিমল ঘোষ (মৌমাছি) ১৩
বকম বকম। গীতাঞ্জলি বিশ্বাস ১৮
স্কাইল্যাব। আদিনাথ নাগ ২৫
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
সদাশিব ১৯, রোভার্সের রয় ২০, টিনটিন ২২
বিশ্বকাপ ২৪, টারজান ২৬, বাঘা ৪৩, গাবলু ৪৭
লেখাপড়া
ভাষার খেলা। কুম্ভক ৪৮
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৪৯
মাধ্যমিকে ফার্স্ট অভিজিতের লেখা দুটি
নমুনা-উত্তর ৫৬
খেলাধুলো
বাংলার দু'নম্বর গোলকীপার। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৫০
লীগ পেল মোহনবাগান। অশোক দাশগুপ্ত ৫২
সেই পিন্টু। ফাইটার ৫৩
ভারত-সফরে অস্ট্রেলিয়া। অলোক দাশগুপ্ত ৫৪
অন্যান্য আকর্ষণ
ছবির মজা ১৮, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
নদনদী ৪২, তোমাদের পাতা ৬৪
আঁকো ৬৬, শেখো ৬৬

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে
ছোটদের জন্য আমাদের উপহার !

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
থেকে বলছি
তোমাদের জন্য এখন আমাদের
তিন-তিনটি
চিলড্রেন্‌স কাউণ্টার

রিচি রোড শাখা ঃ
১৭/২ রিচি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৯

গড়িয়া শাখা ঃ
১২০/এ রাজা এস সি মল্লিক রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৪৭

গড়িয়াহাট শাখা ঃ
১এ, ম্যাডেডিলা গার্ডেনস, কলিকাতা-৭০০ ০১৯
(প্রবেশপথ গড়িয়াহাট রোড)

ভারি মজা তাই না !

- তোমার নিজের নামে সেভিংস ব্যাঙ্ক পাশবই হবে।
- তোমার নিজের সইতে টাকা তুলতে পারবে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
১৭, আর, এন, মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১
চেয়ারম্যান ঃ জে এন বিশ্বাস

Progressive—UIB—55-79

জাপানি পুতুলের আসরে

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট্ট মেয়ে। টুকটুকে লাল পোশাক পরা। দেখতে ঠিক আপেলের মতো। এসেছে জাপানের এহিমে থেকে। নাম হিমে দারুমা। আকারে সাত-আট ইঞ্চির বেশি নয়। চোখে-মুখে মিটমিটে দুষ্টুমি মাখানো। চুপচাপ বসে ছিল টেবিলের ওপর। হালকা কাগজের দেহ। ছবি তোলবার জন্যে ক্যামেরা বাগাতেই টেবিল-ফ্যানের বাতাসে একটু নড়েচড়ে উঠল মনে হল।

কাগজের তৈরি পুতুল-মেয়ে দারুমা দিন-কয়েকের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল মার্চ মাসে। দারুমা অবশ্যই একলা আসেনি। সঙ্গে এসেছিল তার আরও অনেক পুতুল-বন্ধু। দারুমার বন্ধুরা কেউ লম্বা রোগা, কেউ বেঁটে মোটা, কেউ সরু বাঁশের মতো, কেউ ভুঁড়িওলা গোলগাল গাছের গুঁড়ির ধরনের। কেউ করছে খেলা, কেউ আছে শুয়ে, কেউ শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আর কেউ বা আস্তে-আস্তে কাগজের ঘাড় ফিরিয়ে কলকাতার ছোট ছেলেমেয়েদের দেখছে। এরা সবাই দল বেঁধে জাপান থেকে এসে কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ এক হপ্তার ছুটি কাটিয়ে গেল। একসঙ্গে এত রকম জাপানি পুতুলের ভিড় কলকাতায় নিশ্চয় সহজে চোখে পড়ে না। সুতরাং এদের দেখতে খুব জমজমাট ভিড় হচ্ছিল কদিন। তোমরাও হয়তো অনেকে দারুমা, ইজুমেকো এবং ওকামুরা তেনজির সঙ্গে ভাব করে এসেছ ইতিমধ্যে।

কারও সঙ্গে ভাব করেনি, কারও দিকে ফিরে তাকায়নি, শুধু সাত দিন ধরে পড়ে-পড়ে ঘুমিয়েছে যে দু'জন একরত্তি ভাইবোন তাদের নাম নাগাশি বিনা। এদের হয়তো অনেকেই লক্ষ করেনি। একটা লম্বা টেবিলের একেবারে এক কোণে, টুপির মতো ছোট্ট নরম খড়ের বিছানায়, লাল জামা পরে এক ইঞ্চি মাপের এই ভাইবোন সারাক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল সাতদিন ধরে। ওরা এসেছিল জাপানের টটরি অঞ্চল থেকে। ওদের গায়ের জামা এবং খড়ের বিছানা দেখে মনে হল, ওরা নিশ্চয় গ্রামের ছেলেমেয়ে। এবং শহরের গণ্ডগোল ওদের

একেবারে ভাল লাগেনি।

রকমসকম থেকে বুঝলাম কলকাতার ছোটদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে কাগজের তৈরি জাপানি কুকুর ইনুহারিকো।* ইনুহারিকো এসেছিল বিখ্যাত শহর টোকিও থেকে। আদবকায়দাতেও সে বেশ শহুরে। ভালমন্দ খেয়ে চেহারাটি চোখে পড়ার মতো নধর। এবং মুখে বেশ মিষ্টি-মিষ্টি হাসি। আমাকে ছবি তুলতে দেখে জাপানি কায়দায় একটু ফিক করে হাসল মনে হল। কুকুরের মুখে অমন হাসি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

ইনপাকু গিউ কিন্তু ইনুহারিকোর মতো অমন চালাকচতুর নয়। টেবিলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ইনপাকু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল সারাক্ষণ। আর পাঁচটা গোরুর মতোই নেহাত গোবেচারা চেহারা ইনপাকুর। নাগাশি বিনার মতো ইনপাকুও এসেছিল টটরি অঞ্চল থেকে। কিন্তু ভালমানুষ ইনপাকুকে নিয়েই দেখলাম ছোটদের খুব উৎসাহ। কারণ ইনপাকু ঘাড় দুলিয়ে-দুলিয়ে সারাক্ষণ সবদিকে নজর রাখছিল। সে ভারী মজার দৃশ্য!

একরত্তি একটি মেয়ে তো মাৎসুকাওয়া দারুমাকে দেখে একেবারে তার মাকে জড়িয়ে ধরে ভ্যাঁ। ঐ রকম ভয়ঙ্কর পুতুলকে কে না ভয় করবে? মাৎসুকাওয়া এসেছিল জাপানের মিয়াগি থেকে। তার শরীরে সবটাই প্রায় পেট। পেটের মধ্যিখানে জ্বলছে আগুন। আর সেই আগুনে জ্যান্ত ঝলসানো হচ্ছে একটা মানুষকে। মাৎসুকাওয়ার মুখটা ঠিক পেটের

ওপরেই। সেখানে মোটা-মোটা ভুরুর তলায় জ্বলন্ত দুটো গোল-গোল চোখ। পুতুল-মেয়ে খুদে ইজুমেকো পর্যন্ত মনে হল, মাৎসু-কাওয়াকে দেখে ভয়ে জড়সড়। পুতুল-মেয়েদের মধ্যে ইজুমেকো বয়েসে সবচেয়ে ছোট। আর দেখতে এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। ইজুমেকো বসে ছিল একটা ভারী আরামের বাস্কেটে। গলায় তার গোলাপি রঙের একটা মস্ত রিবন বাঁধা। ইজুমেকো নিজে পুতুল হলে কী হবে, সেও যে-কোনো ছোট্ট মেয়ের মতো খেলনা নিয়ে খেলা করে। তাই তার একপাশে ছিল খুব ছোট-ছোট খেলনা, আর অন্য পাশে গোলাপি রিবনের সঙ্গে জড়িয়ে ইজুমেকোর আদরের বেড়াল।

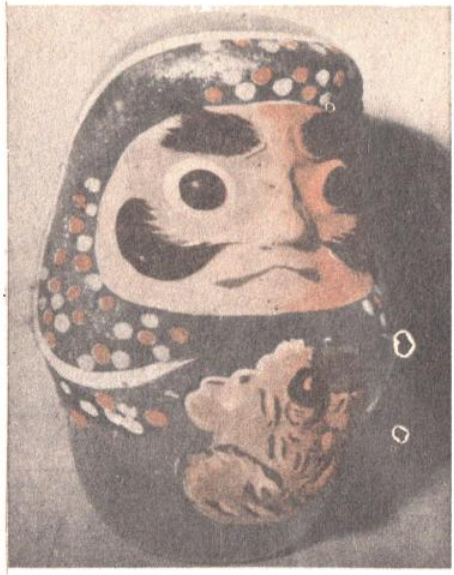

ইজুমেকোর পাশেই ছিল আর এক সুন্দরী মেয়ে। নাম কুশি-ওনেকো। রাংতার পোশাক পরা কুশিকে দেখতে একেবারে হাউই বাজির মতো। কিন্তু কোনো হাউইয়ের অত

সুন্দর মুখ হয় না। এই কুশিকে খুশি করার জন্যে উশিমোরি তেনজি এবং তেইদাকি-কদোমো কত কী কায়দাই না দেখাচ্ছে! উশি-মোরি পরেছে একটা লাল পোশাক আর চড়েছে একটা ষাঁড়ের পিঠে। তার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে ষাঁড়ের পিঠ থেকে সে ছিটকে পড়ল বলে। আর তেইদাকি-কদোমো উশিমোরিকে টেক্কা দিয়ে উঠেছে একটা বিশাল মাছের পিঠে, আর ঐভাবেই সে সমুদ্রে দিব্যি ভেসে চলেছে। কিন্তু উশিমোরি কিংবা তেইদাকি—কেউ যে খুব একটা বাড়াবাড়ি করতে পারবে তা মনে হয় না, কারণ ওদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রয়েছেন ওকামুরা তেনজি। ওকামুরা তেনজি হলেন জ্ঞানের দেবতা। আমাদের শান্ত সুন্দরী সরস্বতীর সঙ্গে ওকামুরার কোনো মিল নেই। এঁকে দেখলেই মনে হয় রাগী গুরু-মশাই। এবং হাতে ভাঙা তলোয়ার—অর্থাৎ লেখাপড়া না করলেই পেট ফুটো করে দিতে পারেন বলে মনে হয়।

ঘরের অন্য ধারে, একটু দলছাড়া হয়ে ছিল একদল খুব সুসজ্জিত পুতুল। ধাপে-ধাপে এদের সাজানো হয়েছিল। জাপানি ভাষায় এই ধাপগুলিকে বলে হিনা-দান। এবং জাপানে প্রতি বছর তেসরা মার্চ যে পুতুল-উৎসবে বাড়িতে-বাড়িতে পুতুলদের ঠিক এইভাবে সাজানো হয় সে উৎসবের নাম হিনা-মাৎসুরি। সবচেয়ে উঁচু ধাপে বসে ছিল সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী পুতুল। তার পরের ধাপে রাজসভার তিনটি মেয়ে। তার পরের ধাপে মন্ত্রীরা। এবং তারপরে বাদক এবং গায়কের দল। এ ছাড়া রয়েছে শিকারী এবং সৈনিক। ধাপের দু-পাশে রাখা ছিল দুটি পীচ গাছ। পীচ গাছ শান্তি আর ভালবাসার প্রতীক। অর্থাৎ পুতুলের দেশে কোনো লড়াই নেই, ঝগড়া নেই, দুঃখ নেই। পুতুলের রাজা ভারী নিশ্চিন্তে রাজত্ব করে।

ম্যাজিশিয়ান

বিমল কর

বছর পঁচিশ পরে দেখা। চিনতেও পারিনি।

অশ্বিনীই আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, "কী রে, চিনতে পারছিস? আমি অশ্বিনী।"

মানুষ যে কত বদলে যায়, অশ্বিনীকে না-দেখলে বোঝা মুশকিল। ছেলেবেলার চেহারা বয়েসে পালটে যায়। তবু একটা আদল ধরা পড়ে। অশ্বিনীর সবই পালটে গিয়েছে। অনেকক্ষণ নজর করে দেখলে হয়তো তার সামনের দাঁত আর কখনও-কখনও চোখের দৃষ্টিতে পুরনো অশ্বিনীকে একটু-আধটু ধরা যায়।

অশ্বিনী আমার হাত ধরে টানল। বলল, "আয়। দোকানে আয়। আমি ধুলুর মুখে শুনেছিলাম, তুই আসছিস।"

ধুলু আমার ভাই। নিজের নয়, দূর সম্পর্কের। বয়েসে অনেক ছোট। শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপারে ধুলুদের বাড়িতেই এসেছি। দিন-দুই থাকার কথা।

দরজির দোকান দিয়েছে অশ্বিনী। বাজারের মধ্যেই। দোকানের নাম রেখেছে 'মনোরমা'। ছোট দোকান। সাধারণভাবে

সাজানো-গোছানো। দোকানের পেছনের দেওয়ালে কাঠের তক্তা দিয়ে বাঙ্ক মতন করে নিয়েছে, সেখানে তার দরজি বসে সেলাই-মেশিন নিয়ে।

অশ্বিনী আমাকে তার চেয়ারে বসাল। নিজে বসল একটা টুলের ওপর। বলল, "কত কাল পরে তোকে দেখলাম, বিজন। কেমন আছিস বল?"

বলার আর কীই বা ছিল। "চাকরি-বাকরি, ঘরসংসার, ছোটখাট অসুখ-বিসুখ নিয়ে সাধারণ মানুষ যেমন করে বেঁচে থাকে সেই-ভাবেই দিন কাটছে।" বললাম অশ্বিনীকে। শেষে বললাম, "তুই কেমন আছিস তাই বল?"

অশ্বিনী বলল, "আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস। এই দোকান নিয়ে আছি। চলে যাচ্ছে কোনো রকমে।" বলে অশ্বিনী উঠল। "দাঁড়া, একটু চায়ের কথা বলে আসি। পাকোড়া খাবি? সেই মতিয়ার দোকানের পাকোড়া। মতিয়া অবশ্য নেই, তার ভাইপো দোকান চালায়।"

অশ্বিনীকে খুশি করতেই আমি মাথা নাড়লাম। অশ্বিনী চলে গেল।

দোকান ফাঁকা। রাত হয়ে আসছে। যদিও মাসটা ফাল্গুন, তবু কলকাতার মতন গরম পড়ে যায়নি। একটু শীতের ভাব রয়েছে।

আমার বারবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। অশ্বিনী আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে হাই স্কুল পর্যন্ত পড়েছি। খেলাধুলো করেছি একসঙ্গে। থাকতামও এক পাড়ায়।

স্কুল ছাড়বার পর থেকে আর তেমন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। আমার বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার করে ধানবাদ ছাড়লেন। আমিও ছাড়লাম। মাঝে এক-আধবার দু-এক দিনের জন্যে এসেছি হয়তো ধুলুদের বাড়ি, অশ্বিনীকেও দেখেছি, কিন্তু এবার যেমন দেখলাম সে-রকম নয়।

ছেলেবেলায় অশ্বিনী ছিল যেমন হুজুগে তেমনি বেপরোয়া। তার বাবা, আমাদের কামাখ্যাকাকা, ছিলেন রেলের ছোট ডাক্তার। দেখতে বড় সুন্দর ছিলেন। বড়দের সঙ্গে থিয়েটারও করতেন। অশ্বিনী অত সুন্দর ছিল না দেখতে, কিন্তু সুশ্রী ছিল। তার চোখ-নাক ছিল চমৎকার চেহারাটা অবশ্য গণেশ-গণেশ

ছিল। অশ্বিনী বেশ শৌখিন ছিল। ফিটফাট প্যান্ট-শার্ট পরে স্কুলে যেত। তার পকেটে পাট করা রুমাল থাকত। আমরা তখন বাচ্চাদের পকেটে রুমাল থাকার কথা ভাবতেই পারতাম না।

অশ্বিনীর ছেলেবেলা থেকেই শখ ছিল ম্যাজিশিয়ান হবে। ধানবাদের রেলবাবুরা পেল্লয় করে যে এক্সিবিশান করতেন সেখানে গণপতির ম্যাজিক দেখার পর থেকেই তার মাথায় এই শখ চাপে। অশ্বিনী বটতলার ম্যাজিকশিক্ষার বই আনিয়ে ম্যাজিক শিখত, আর আমাদের দেখাত।

ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে অশ্বিনী অনেকবার মরতে মরতে বেঁচে গেছে। একবার সে কলা খেয়ে মুখ থেকে ছুঁচ বার করতে গিয়ে মরমর হয়েছিল। আর-একবার যা করেছিল, আরও মারাত্মক। কাচের টুকরো চিবিয়ে খেতে গিয়েছিল। বইয়ে পড়েছিল আদার রসে কাচের টুকরো ভিজিয়ে উনুনের পাশে রেখে গরম করে নিলে কাচ হজম করা যায়। সেই কায়দাটা দেখাতে গিয়ে গাল জিভ কেটে যায়-যায় অবস্থা হয়েছিল অশ্বিনীর। ছেলেবেলার এই-সব বোকামি সে অবশ্য শুধরে নিয়েছিল, কিন্তু ম্যাজিকের নেশা তার মাথা থেকে যায়নি। আমরা যখন স্কুল ছেড়ে চলে আসি, তখন সে অনেক পাকা ম্যাজিশিয়ান; সরস্বতী-পুজোর দিন স্কুলে সে ম্যাজিক দেখাত।

ম্যাজিশিয়ান অশ্বিনী আজ সাদামাটা একটা দরজির দোকান দিয়ে বসে আছে—এ যেন ভাবাই যায় না। তা ছাড়া তার চেহারা? সেই সুশ্রী, শৌখিন অশ্বিনীর আজ কী বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েছে। রোগা, হাড়-হাড় চেহারা, মুখ শুকিয়ে বুড়োদের মতন চিমসে হয়ে গিয়েছে, মুখের কথা জড়ানো, মাথার চুল পাতলা, পোশাক-আশাকও একেবারে মামুলি। ওকে দেখলে দুঃখই হয়।

অশ্বিনীর কথাই ভাবছিলাম, এমন সময় অশ্বিনী ফিরে এল। হাতে শালপাতার ঠোঙায় পাকৌড়া। বলল, "আমি খাব না, তুই খা। গরম ভাজিয়ে আনলাম। চা আসছে।"

পাকৌড়া খেতে-খেতে আমি বললাম, "তোর এই দরজির দোকান কত দিনের?"

"তা বছর ছয়েক হবে।"

"মনোরমা নাম দিয়েছিস কেন?"

"আমার মায়ের নাম মনোরমা।"

আমার খেয়াল ছিল না কাকিমার নাম। অপ্রস্তুত হলাম। তার পরই বললাম, "তুই আর কিছু করতে পারলি না? চাকরি-বাকরি? অন্য কোনো ভাল ব্যবসা?"

"চাকরি করেছি। ভাল লাগত না। ঝগড়া-ঝাটি হত। ছেড়ে দিয়েছি।"

"কিন্তু এই দরজির দোকানে তোর চলে?"

"চলে যাচ্ছে। আমার আর আছেটা কী। মা নেই, বাবা নেই। দিদি ছিল। সেও নেই। আমি একলা থাকি। নিজেই রান্নাবান্না করি খাই।"

এমন সময় চা এল। দেখলাম, অশ্বিনীর জন্যে চা আসেনি। বললাম, "তুই চা খাবি না?"

"না। তুই খা।"

চা খেতে খেতে আমি হেসে বললাম,

"তোর সেই ম্যাজিক? ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছিস?"

অশ্বিনী আমার দিকে তাকাল। পাতা পড়ল না চোখের। একবার যেন দৃষ্টিটা কঠিন ও রুক্ষ হল, তারপর ধীরে-ধীরে সেই রুক্ষ-ভাব মোলায়েম হয়ে এসে কেমন যেন মলিন হল।

অশ্বিনী বলল, "লোক-দেখানো ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছি।"

কথাটা কানে লাগল। বললাম, "তার মানে? ম্যাজিক তো লোকেই দেখে।"

"ও ম্যাজিক আর আমি দেখাই না।"

"অন্য ম্যাজিক দেখাস নাকি?" আমি ঠাট্টা করে হাসলাম, "সেটা আবার কী?"

অশ্বিনী ম্লান করে হাসল; কোনো জবাব দিল না কথার।

চা খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। অশ্বিনী চুপচাপ। আমার কেমন ভাল লাগছিল না। অস্বস্তি হচ্ছিল। অশ্বিনীর হঠাৎ এমন বোবা হয়ে যাওয়া কেন? সে মাঝে-মাঝেই আমার কেমন করে যেন দেখছে। তা ছাড়া এসে পর্যন্ত লক্ষ করছি, অশ্বিনী কথা বলার সময় মুখের সামনে রুমাল ধরে রাখছে। কী খারাপ অভ্যেস।

অসহিষ্ণু হয়ে আমি বললাম, "তুই যেন কী ভাবছিস! আমায় অমন করে দেখছিস কেন?...রুমালটাই বা মুখের সামনে ধরে রেখেছিস কেন?"

অশ্বিনী রুমাল সরাল না। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল; তারপর বলল, "তোকে একটা কথা বলতে পারি। বিশ্বাস করবি?"

"কী কথা?"

"শুনলে হাসবি। ভাববি, আমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

আমি হেসে ফেলে বললাম, "তোর তো প্রথম থেকেই মাথার গোলমাল। ছেলেবেলায় ব্যাচ চিবিয়ে খেতে গিয়ে মরতে বসেছিলি, মনে নেই!"

অশ্বিনী হাসির মুখ করল।

আমি বললাম, "তোকে কত বছর পরে দেখছি, অশ্বিনী। আমার ভাল লাগছে না। এই দরজির দোকান, তোর চেহারা, চোখ মুখ সব যেন কেমন লাগছে। সত্যি করে বল তো, তোর কী হয়েছে? আমি হাসব না।"

অশ্বিনী বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। নিশ্বাস ফেলল বড় করে। তারপর বলল, "তোকে যা বলছি সত্যি করেই বলছি। এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না। মিথ্যে বলছি না।" বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অশ্বিনী বলল, "বছর আষ্টেক আগের কথা। মা বেঁচে আছে। বাবা নেই। তখন আমি একটা চাকরি করতাম। তবে চাকরিতে আমার মন ছিল না। মন ছিল ম্যাজিকে। ম্যাজিকই ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান। কত টাকা-পয়সাই না খরচ করেছি ম্যাজিকের জিনিসপত্র তৈরি করতে, সাজ-পোশাক বানাতে। ছোটখাট একটা দলই তৈরি করে ফেলেছিলাম আমি। এ-সব দিকে—মানে তোর কোলিয়ারিতে, মেলায়, রেলের ক্লাবে, চ্যারিটি শোয়ে আমার ডাক পড়ত। দলবল নিয়ে যেতাম। খেলা দেখাতাম। টাকা-পয়সাও পেতাম। একবার কাতরাসগড়ে আমাদের ডাক পড়ল। কালীপুজোর সময়। খেলা দেখাতে গেলাম দলবল নিয়ে। সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল, তুই চিনবি না, ভজনদার মেয়ে। তার নাম ছিল টুনি। দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি স্মার্ট। টুনিকে নিয়ে আমরা দু-তিনটে খেলা দেখাতাম। তার মধ্যে একটা ছিল হাসি-হুল্লোড়ের, বড় বেতের টুকরির মধ্যে টুনিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হত—আর চোখের পলকে ভ্যানিশ হয়ে যেত টুনি, তার বদলে টুকরি থেকে এক জোড়া খরগোশ বেরিয়ে আসত।"

অশ্বিনী কথা বলতে বলতে থামল একবার। বাইরের দিকে তাকাল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "অন্য দুটো খেলার মধ্যে একটা ছিল, টুনি ছুরি দিয়ে আমার জিব কেটে দেবে, রক্ত পড়বে গলগল করে, আবার কাটা জিব জোড়া হয়ে যাবে। সোজা খেলা। তুইও ছেলেবেলায় স্কুলে যাবার সময় রাস্তার ধারে এই খেলা দেখেছিস—মাদারিরা দেখাত। খেলাটাকে চটকদার করার জন্যে আমি টুনির মতন বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে খেলাটা দেখাতাম। তাকে খুব ভাল করে খেলাটা শিখিয়েছিলাম। ...সেদিন কিন্তু কী যে হল কে জানে! সহজ খেলা। অজস্রবার দেখিয়েছি। অথচ ওই দিনটাতে সব গোলমাল হয়ে গেল, ভুল হয়ে গেল আমাদের। টুনি আমার আসল জিবে ছুরি চালিয়ে দিল।"

আমি চমকে উঠলাম। বলে কী অশ্বিনী!

নতুন বই

কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা ১২৲

স্বামিজীর জীবন কথা ১২৲

মানুষ রবীন্দ্রনাথ ১০৲

কিশোর সাহিত্য

কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়ের আরও বই

ছোটদের সুভাষচন্দ্র ২৲

ছোটঃ রামকৃষ্ণ ২৲ ছোটঃ টলস্টয় ২৲

ছোটঃ নেতাজী ২৲ ছোটঃ ভূদেবচন্দ্র ২৲

ছোটঃ আনন্দমঠ ৩৲

অমরনাথ রায়

বিজ্ঞানের খোস গল্প ৬৲

জে. এইচ. প্যাটারসন্

সাভোর মানুষখেকো ১০৲

লীলা মজুমদার

ভারতের উপকথা (১ম) ৪৲ (২য়) ৫৲

মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত

ভয় দেখান ভয়ংকর [১-৭] প্রতি খণ্ড ৪৲

চিরঞ্জীব সেন

অলিম্পিকের গল্প ৫৲

আশ্চর্য নিখোঁজ ৬৲

আজও রহস্য ৫৲

রক্ত কল্লোল ৫৲

সুজিতকুমার নাগ

মায়াময় রূপকথা ৫৲

শিবরাম চক্রবর্তী

বিশ্বপতির অশ্বমেধ ৫৲

নির্মল ঘোষ

জঙ্গলে একা ৬৲

মহাশ্বেতা দেবী

জাতক কাহিনী (২য়) ৩৲

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেবী চৌধুরাণী ৩৲

দক্ষিণারঞ্জন বসু

ঈশ্বরের সেনাপতি ৫৲

সম্রাট সেন

সিংহাসনে রাজা নেই ৫৲

শক্তিপদ রাজগুরু

বনে গেলেন গবুদা ৫৲

জগন্নাথ বিশ্বাস

শিকারী চিতা ৫৲

করুণা প্রকাশনী

১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, ফোন ৩৪-৬২৬৮

ওর জিব নেই নাকি? তা হলে কথা বলছে কেমন করে?

আমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী বলল, "তুই ভাবছিস, আমার জিব কি কেটে ফেলেছিল টুনি? না। সবটা কাটেনি। জিবের একটা পাশ কেটে গিয়েছিল; তাতেই যা রক্ত পড়েছিল তুই কল্পনাও করতে পারবি না। হাসপাতালেও ছিলাম বেশ কিছুদিন।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, "সেই থেকে ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছিস?"

মাথা হেলিয়ে অশ্বিনী বলল, "হ্যাঁ; ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো তোকে বলিনি এখনও। আমার জিব ধীরে ধীরে আবার আগের মতন হয়ে এল খানিকটা, ভাবলাম বেঁচে গেলাম। পরে দেখলাম, জিবটা আগের মতন আর হচ্ছে না। রঙটা দিন দিন কালো হয়ে যাচ্ছে, আর ধারগুলো কেমন গুটিয়ে থাকে। কথা বলতে আগে বেশ কষ্ট হত। এখন অনেকটা সামলে নিয়েছি।"

কৌতূহল বোধ করে বললাম, "দেখি তোর জিব?"

অশ্বিনী মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, "দেখা না, কী হয়েছে?"

অশ্বিনী আমার চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "না রে, দেখিস না।"

"কেন?"

"আমার জিব কাউকেই আমি দেখাই না। মা আমার জিব দেখত, মারা গেল। বাজারের দাস ডাক্তার আমার জিব দেখেছিল—সেও মারা গেল। আমার জিব দেখলে খারাপ হয়। আমি কারুর সামনে জিব দেখাই না।"

আমার বিশ্বাস হল না।

তারপরই মনে পড়ল, অশ্বিনী আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আগাগোড়া মুখের সামনে রুমাল আড়াল করে রেখেছিল। সে কোনো-কিছুই খায়নি।

অশ্বিনীর কথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না, আবার কেমন ভয়ও করছিল। অশ্বিনী কার জিব নিয়ে বেঁচে আছে কে জানে! তার, না, অভিশপ্ত কোনো জীবের, কে জানে।

ছবি সুধীর মৈত্র

তাল-বেতাল

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

গুমোট গরম ভাদ্রমাস
ভাদ্র হাওয়ায় তালের বাস
তালের গন্ধ মাতাল করে
তাল-বেতালরা রান্নাঘরে।

রান্নাঘরে তেলের কড়া
তেলের কড়ায় তালের বড়া!
ছ্যাঁক কলকল শব্দ মিঠে
তাল-ফুলুরি তালের পিঠে।

তালের পিঠে চাখার তরে
ধুন্ধুমার রান্নাঘরে!
গরম গরম মুখে পোরে
বোঁচন বুবুর জিভটা পোড়ে!

কান্না চেঁচামেচির চোটে
আন্না মাসি লাফিয়ে ওঠে!
খুন্তি হাতে চক্ষু লাল
তাল-বেতালের কাটল তাল!

ছবি দেবাশিস দেব

কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে

জয়রামবাবুর মাতৃহারা একমাত্র ছেলে জ্যোতিকে নিয়ে বাড়ির ভৃত্য গোপাল রোজ বিকেলে পার্কে বেড়াতে যায়। হঠাৎ সে আজ ফিরে এসে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "খোকাবাবু হারিয়ে গেছে বাবু!" তারপর....

২

জয়রামবাবু তখন চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, "হারিয়ে গেছে? হারিয়ে গেছে মানে?"

গোপাল তখন তেমনি কাঁদছে আর ভয়ে কুঁকড়ে আছে। বাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি কোনও দোষ করিনি আজ্ঞে। খোকাবাবু পার্কের ভেতরে খেলা করছিল, আর আমি সামনে বসে পাহারা দিচ্ছিলুম..."

"তারপর?"

"তারপর দেখি খোকাবাবু নেই—"

জয়রামবাবু বলে উঠলেন, "অমনি খোকাবাবু তোর চোখের সামনে থেকে উড়ে গেল?"

ঘরের মধ্যে পাড়ার যে-সব ভদ্রলোক বসে ছিলেন তাঁরাও গোপালের কথায় রেগে উঠলেন। বললেন, "মানুষ কখনও হঠাৎ চোখের সামনে থেকে উড়ে যেতে পারে? যত বাজে কথা! আপনি ছাড়বেন না ওকে শুধু-শুধু, ও নিশ্চয়ই কোথাও কারো সঙ্গে বসে-বসে আড্ডা দিচ্ছিল—"

জয়রামবাবু গোপালকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, তুই খোকাবাবুর সামনে বসে ছিলি, না অন্য কোথাও কারো সঙ্গে দূরে বসে আড্ডা দিচ্ছিলি।"

গোপাল বললে, "না বাবু, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি কোথাও কারো সঙ্গে আড্ডা দিতে যাইনি, আপনি সকলকে জিজ্ঞেস করুন গিয়ে। পার্কে তো অনেক লোক যায়, তাদের সকলকে জিজ্ঞেস করুন, তারা আমায় খোকা-বাবুর সামনে বসে থাকতে দেখেছে, আপনি যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই বলবে—"

জয়রামবাবু বললেন, "জিজ্ঞেস করবার দরকার কী? আমি তোকে যা বলছি সেই কথাটার জবাব আগে দে। তুই যদি সামনেই বসে থাকবি তো ছেলে গেল কোথায়?"

গোপাল বললে, "তাই তো বলছি বাবু, কোথায় যে গেল খোকাবাবু তা আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।"

"পার্কে আর কোন্-কোন্ ছেলে ছিল?"

"যাদের সঙ্গে খোকাবাবু রোজ বল খেলে তারা ছিল। তারা সবাই মিলে বল খেলছিল, আর আমি দূরে বসে তাদের খেলা দেখছিলুম। তারপর বেলা হয়ে আসছিল। ভাবলুম এবার খোকাবাবুকে ডেকে নিয়ে বাড়ি ফিরব, তা চেয়ে দেখি সবাই রয়েছে, শুধু খোকাবাবুই নেই!"

জয়রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর তুই কী করলি?"

"আমি জনে-জনে সকলকে জিজ্ঞেস করলুম আমার খোকাবাবু কই, তারা সবাই বললে, আমি জানি না। আমি তখন কেঁদে ফেলেছি হুজুর। আমার খুব ভয় করতে লাগল। আমি পার্কের সবাইকে বলতে লাগলুম আমাদের খোকাবাবুকে দেখেছেন? সবাই একই কথা বলতে লাগল। তারা বললে, তুমি বাড়ি যাও, বাড়ি গিয়ে দেখো গে, তোমার খোকাবাবু ঠিক একলা বাড়ি চলে গেছে।"

"তারপর?"

এমন সময় জ্যোতির মাস্টার মশাই ঘরে ঢুকল। প্রতিদিন এই সময়েই সে জ্যোতিকে পড়াতে আসে। ছেলেটি পাড়ায় থাকে না বটে, কিন্তু পাড়ার অনেককে চেনে। একদিন এই পাড়ার স্কুল থেকেই পাস করে বেরিয়েছিল। তারপর এখন বি-এ পাস করেছে কলেজ থেকে। জয়রামবাবু বেছে বেছে নিজের ছেলেকে পড়াবার জন্যে একেই রেখেছিলেন। বড় বিনয়ী, বড় বুদ্ধিমান। কাজেও যেমন বিনয়ী নামেও তাই। নামটাও বাপ-মা বুঝে-সুঝে রেখেছিল—বিনয়।

বিনয় ঘরের মধ্যেকার ব্যাপার দেখে অবাক। জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে জ্যাঠা-মশাই?"

জয়রামবাবু বললেন, "আর কী হয়েছে, সব্বনাশ হয়েছে আমার। রোজ যেমন গোপালের

সঙ্গে পার্কে বল নিয়ে জ্যোতি খেলতে যায়, আজও তেমনি গিয়েছিল, এখন, এই দেখ না, এই গোপাল ফিরে এসে বলছে—খোকাবাবু নেই!''

"নেই মানে?''

জয়রামবাবু বললেন, "মানে আমি কী জানি! ওকেই তুমি জিজ্ঞেস করো না, ওই বলবে কী হয়েছে—''

বিনয় গোপালকে জিজ্ঞেস করলে কী ব্যাপার হয়েছে। গোপাল এতক্ষণ যে কথা বলছিল তা-ই আবার বললে।

বিনয় বললে, "তা বলে জ্যোতি তো কোথাও উড়ে যেতে পারে না। কোথাও না কোথাও সে আছেই। আচ্ছা, আমি নিজে একবার পার্কে যাচ্ছি, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি দেখছি আমি কী করতে পারি।''

তারপর গোপালকে বললে, "চল, আমার সঙ্গে একবার চল, কোথায় জ্যোতি বল খেলছিল আমাকে দেখিয়ে দিবি চল্!''

তারপর জয়রামবাবুর দিকে চেয়ে বললে, "আপনি বসুন, আমি ফিরে এসে আপনাকে বলব কী হয়েছে।''

বলে গোপালকে নিয়ে বিনয় বাইরে চলে গেল।

জয়রামবাবু তখন খুব ভাবনায় পড়ে গেছেন। পাড়ার যারা এসেছিল গল্প করতে, তারা বললে, "কিছু ভাববেন না চাটুজ্যে মশাই, বিনয় যখন গেছে, তখন ঠিক একটা-কিছু বিহিত হবেই, ও খুব বুদ্ধিমান ছেলে।''

দরজার ভেতর থেকে কৈলাস, ভৈরব, যারা উঁকি দিচ্ছিল তারা তখন সরে পড়েছে।

জয়রামবাবুর মুখ দিয়ে তখন কোনও কথা বেরোচ্ছে না। তিনি যেন তখন হতভম্ব হয়ে গেছেন। যদি জ্যোতিকে না পাওয়া যায়? মা-মরা ছেলে, মা মারা যাবার পর থেকে তিনিই নিজে বুকে করে জ্যোতিকে মানুষ করেছেন।

সামনের সকলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শেষ পর্যন্ত যদি জ্যোতিকে না

শুধু ছোটদের জন্য

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে আনন্দ উপহার

অগ্রগণ্য লেখকদের সেরা কিশোরসাহিত্য-সম্ভার যাতে সুলভে ও ঝলমলে চেহারায় ছোটদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে-বিষয়ে প্রথমাবধি প্রযত্নবান আনন্দ পাবলিশার্স। এ-বছর আরও ব্যাপক ও সামগ্রিক করে তোলা হয়েছে এই লক্ষ্যকে। অনেক নতুন-নতুন বই বেরুচ্ছে হৈ হৈ করে, হরেক মন-মাতানো চেহারায়। সেই সঙ্গে আরেকটি আনন্দ-সংবাদ ঃ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯ এই ঠিকানায় খোলা হয়েছে ছোটদের বইয়ের দোকান।

এই নতুন বিক্রয়কেন্দ্রে আনন্দ পাবলিশার্স-এর যাবতীয় ছোটদের বই পাওয়া যাবে। ছোটদের মনের মতো করে সাজানো, রঙীন, ঝকমকে এই বিক্রয়-বিপণিতে ছোটরা নিজেরা পছন্দ করে যাতে বই কিনতে পারে তার সব-রকম ব্যবস্থা রয়েছে। হাত বাড়ালেই লোভনীয় ক্যাটলগ, হাত বাড়ালেই ঘুম কেড়ে-নেওয়া সব বই।

শুধু তাই নয়, এই দোকান থেকে ছোটদের যে-কোনো বই কিনলে ক্রেতাদের শতকরা পনের টাকা কমিশন।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে এই কমিশন দেওয়া হবে একটি বিশেষ সময়কালের জন্য।

যাঁরা বাইরে থাকেন তাঁরাও শতকরা পনের টাকা কমিশন পেতে পারেন ছোটদের বইয়ের ওপর। সেক্ষেত্রে অর্ডারের সঙ্গে অগ্রিম টাকা পাঠাতে হবে।

সুতরাং দেরি নয়, চটপট চলে এসো সব্বাই। এক্ষুনি।

পুজোর আনন্দ-উপহার হোক আনন্দ পাবলিশার্স-এর ছোটদের বই ॥

সুকুমার রায়ের সমগ্র শিশু-সাহিত্য ১০% কমিশন

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ 'নেতাজী, এ পিকটোরিয়াল বায়োগ্রাফি' (চিত্রে নেতাজীর জীবনকথা) বইটিও এই দোকানেই পাবে।

চিঠিপত্র এবং টাকা পাঠাবার ঠিকানা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

পাওয়া যায় তো কী করব বলুন তো মল্লিক-মশাই?''

মল্লিক মশাই বললেন, "পাওয়া যাবে না, বলছেন কী? আপনি অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? জ্যোতির গায়ে তো কোনও সোনা-দানা নেই যে চুরি করবে! ছেলেকে কে চুরি করতে যাবে? সে-সব আগের দিনে হত। যেবার সারা ব্রিজ তৈরি হচ্ছিল, তখন চারদিকে খুব ছেলে-চুরির হিড়িক পড়েছিল। লোকে বলত ছেলে ধরে তাকে খুন করলে ব্রিজ নাকি খুব মজবুত হয়। তখন কলকাতার লোকরা ছেলেদের কাউকে বাইরে বেরোতে দিত না। বাবার কাছে শুনতুম। এখন ব্যাংক লুট-পাট, সোনা-দানা চুরি, এই সব হয়। দেখছেন না, খবরের কাগজে তো রোজই পড়ছি সোনার দোকানে ডাকাত পড়েছে।''

সরকার মশাই বললেন, "আমাকে তো তখন বাবা বাড়ি থেকে বেরোতেই দিতেন না। বলতেন ছেলে-ধরা এসেছে, বাইরে বেরিও না।''

মল্লিক মশাই বললেন, "সে-সব দিনের কথা আলাদা, তখন ইংরেজদের রাজত্ব। লোকে পুলিস দেখলে ভয় পেত। এখন তো কেউ কাউকে ভয় করে না। তখনকার গোরা পুলিস-দের চেহারা মনে আছে তোমার? যেন আপেলের মতো লাল টকটক করত। দেখলেই আমরা ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তুম।''

এ-সব কথা জয়রামবাবুর কানে যাচ্ছিল না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "কী যে করি, কিছু বুঝতে পারছি না—''

মল্লিক মশাই বললেন, "একটু ধৈর্য ধরে থাকুন, বিনয় তো খোঁজ নিতে গেছে, ফিরে এসে কিছু একটা রিপোর্ট দেবেই।''

জয়রামবাবু বললেন, "পুলিসে খবর দিলে হয় না?''

মল্লিক মশাই বললেন, "জ্যোতিকে পাওয়া না গেলে শেষ পর্যন্ত তো তাই-ই করতে হবে। শেষ রাস্তা তো রইলই।''

বেশক্ষণ আর কেউ দাঁড়ালেন না। সকলেরই তখন দেরি হয়ে গেছে। বাড়ি যাবার সময় হয়ে গেছে তখন সকলেরই।

জয়রামবাবু আর বসে থাকতে পারলেন না। তাঁর মন তখন ভেতরে-ভেতরে ছটফট করছে। তিনি দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাস্তা দিয়ে বাস, ট্রাম, সাইকেল, রিকশা সব চলেছে। ভিড়ে ভিড়। তিনি দূরে পার্কটার দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে। পার্কটা সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু যে-রাস্তাটা চলে গেছে পার্কের দিকে, সেই দিকে চেয়ে রইলেন। কই, বিনয়কে তো দেখতে পাচ্ছেন না। কোথায় গেল বিনয়? এতক্ষণ তারা পার্কে কী করছে?

বিনয় যখন এল তখন চারদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। সঙ্গে রয়েছে গোপাল। গোপাল আসছে পেছন-পেছন।

বিনয় কাছে আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল? পেলে কিছু হদিস?''

বিনয় বললে, "পেয়েছি।''

"কই, জ্যোতি কোথায়?''

বিনয় বললে, "জ্যোতিকে পাইনি, কিন্তু তার একটা হদিস পেইছি।''

''কী হদিস? বলো, শিগগির বলো।''

বিনয় বললে, "প্রথমে খুব খুঁজলুম জ্যোতিকে। যারা বেঞ্চিতে বসে ছিল, তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ বলতে কিছু পারলে না।''

"তারপর? তারপর?''

"তারপর পাড়ার দিকে যাব ভাবছিলাম। যে-সব বাড়ির ছেলেরা পার্কে খেলতে আসে তাদের বাড়িতে যদি জ্যোতি গিয়ে থাকে, তাই খোঁজ নিলাম।''

"তারা কী বললে?''

বিনয় বললে, "তাদের সকলকে কি আমি চিনি? তারা রোজ খেলতে আসে, এই পর্যন্ত। কিন্তু কারো বাড়ির ঠিকানা তো কেউ জানে না।''

"তাদের সঙ্গে দেখা হল?''

বিনয় বললে, "দেখা তো হল, কিন্তু তারা কেউ কিছু বলতে পারলে না। সেখান থেকে বেরিয়ে আবার এলাম পার্কে। ভাবলাম মালিদের কাছে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করি।''

জয়রামবাবু বললেন, "মালিদের কাছে গেলে কেন? মালিরা কি এত লোককে চিনে রাখতে পারে? যা হোক, তারপর?''

বিনয় বললে, "একজন মালি বললে, কে একজন ভদ্রলোক নাকি তাকে একটা চিঠি দিয়ে চলে গেছে।''

"কিসের চিঠি?''

বিনয় চিঠিটা জয়রামবাবুর হাতে দিয়ে বললে, "এই দেখুন, এতে কী লেখা আছে।''

জয়রামবাবু তাড়াতাড়ি চিঠিটা হাতে নিলেন। চিঠিটার মুখ খোলাই ছিল। ভেতর থেকে চিঠিটা বার করে তিনি আলোর তলায় পড়তে লাগলেন—

চিঠিতে লেখা আছে—

মহাশয়,

আপনার ছেলেটিকে আমি নিয়ে গেলাম। আপনার ছেলেটি ভারী বুদ্ধিমান। আমি তাকে ভাল করে মানুষ করব। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি ভাল করে তাকে লালন পালন করে মানুষ করে একদিন আবার আপনার কাছে ফেরত দেব। আপনি আমাকে খোঁজবার চেষ্টা করবেন না। পুলিসেও খবর দেবেন না, কারণ তাতে আপনার ছেলেরই ক্ষতি হবে। ইতি— (ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

বকম্ বকম্

গীতাঞ্জলি বিশ্বাস

রকম-রকম পেখম মেলা
বকম্-বকম্ পায়রা,
নীল আকাশে উড়ছে, যেন
দুলছে ফুলের টায়রা।
আয় গেরেবাজ, লক্কা, লোটন
আয়রে গোলা, মুক্‌কি,
রাত পোহালে সাত সকালে
উড়তে এমন সুখ কি?
তারচে' কেন শিকলি বাঁধা
খাঁচার ভেতর আয়না,
যেমন থাকে সেই পাখি, যে
ওড়ার কষ্ট চায় না।
শিখবি বুলির নানান ধরন—
কানুন এবং কায়দা,
রোদে-জলে নিত্য এমন
ওড়ায় কি আর ফায়দা?

ছবির মজা

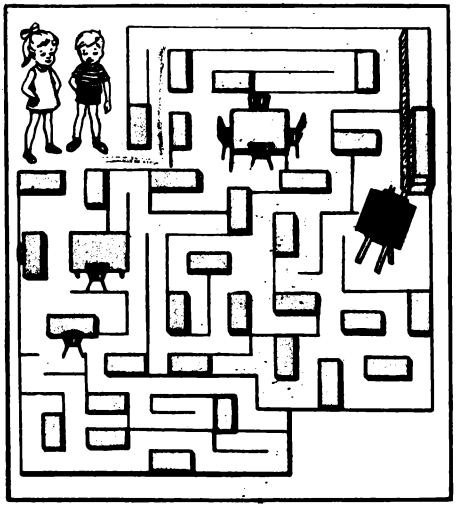

একদিকে ভাই আর বোন, অন্যদিকে তাদের ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ড। কোন্ পথ ধরে এগুলে ভাইবোন ওই ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে পৌঁছতে পারবে?

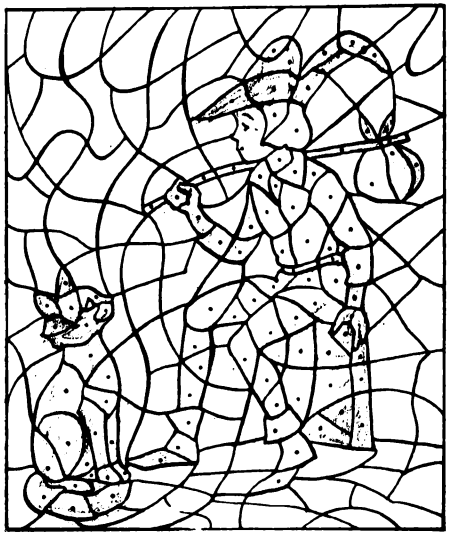

এই ছবির ফুট্‌কি-দেওয়া অংশগুলিকে রঙিন পেনসিল দিয়ে ভরাট করে দ্যাখো, ভারী চমৎকার একটা ছবি পেয়ে যাবে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

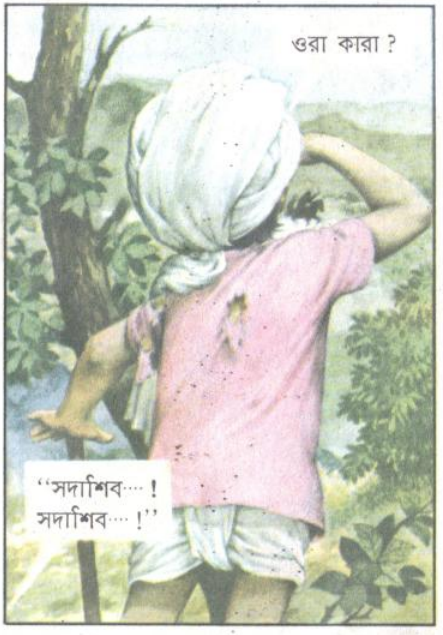

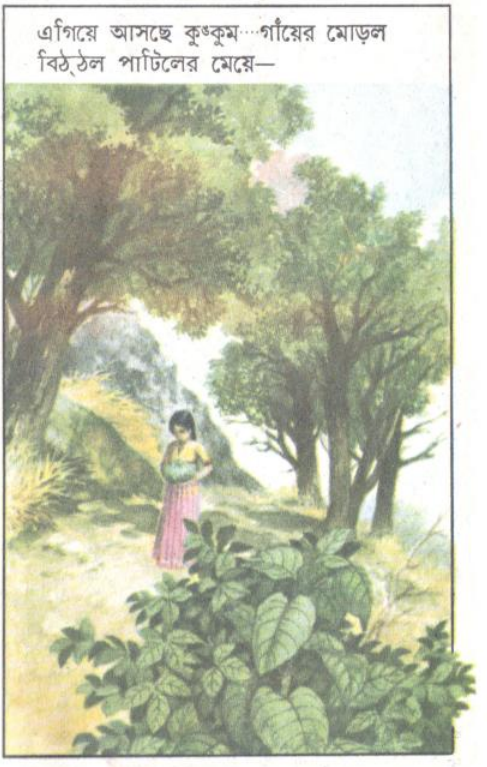

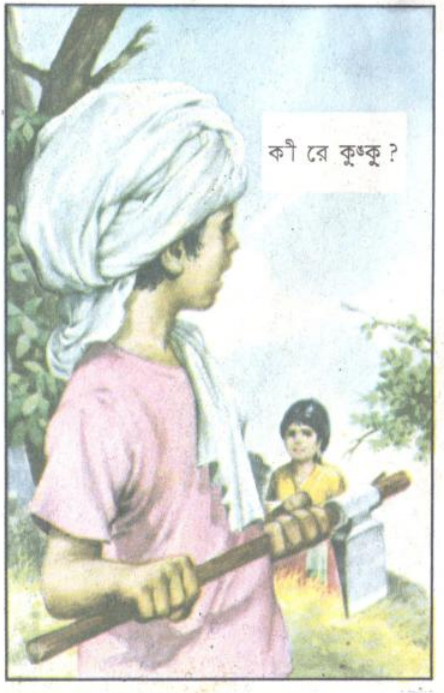

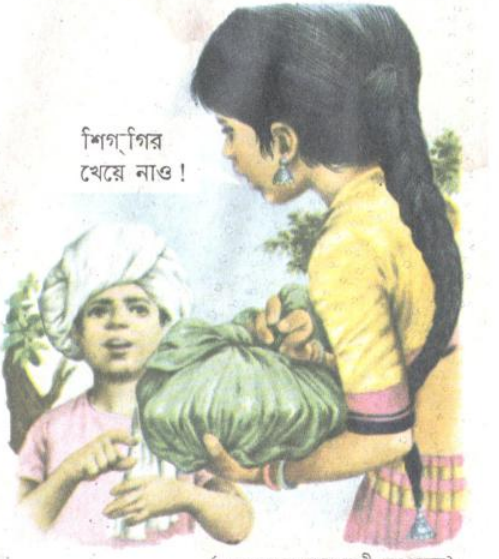

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
মার ! মার !
মাঠে নেমো না ! ফিরে যাও !
ব্র্যাকি, ওরা কথা শুনবে না ! এসো, সুড়ঙ্গ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাই !
এক্ষুনি আমাকে মাইকের কাছে নিয়ে চলো !
চলো ! চলো !
কিছু বলো গুরু !
টিকিট কেটে লোকেরা খেলা দেখতে এসেছে ! তোমাদের...
গুণ্ডামি দেখতে আসেনি! ফিরে যাও! আবার আমি গোল দেব!
আমার গোল দেখতে চাও তো শান্ত হয়ে খেলা দ্যাখো !
হ্যাঁ, হ্যাঁ !
ঠিক কথা !
রয়ের কথায় মন্ত্রের মতো কাজ হল !
যাক, ওরা ফিরে গেছে !
রয়কে ওরা সত্যিই ভালবাসে !
রয়ের গোল নাকচ করায় মেলচেস্টারের ভক্তরা খেপে গিয়েছিল !
না না, ওরা
রেফারী শেষপর্যন্ত নিরাপদ পথটাই বেছে নিলেন !
দুটো গোলই নাকচ !
এবারে দেখা যাক, কী হয় !
রেসি, এগোও !

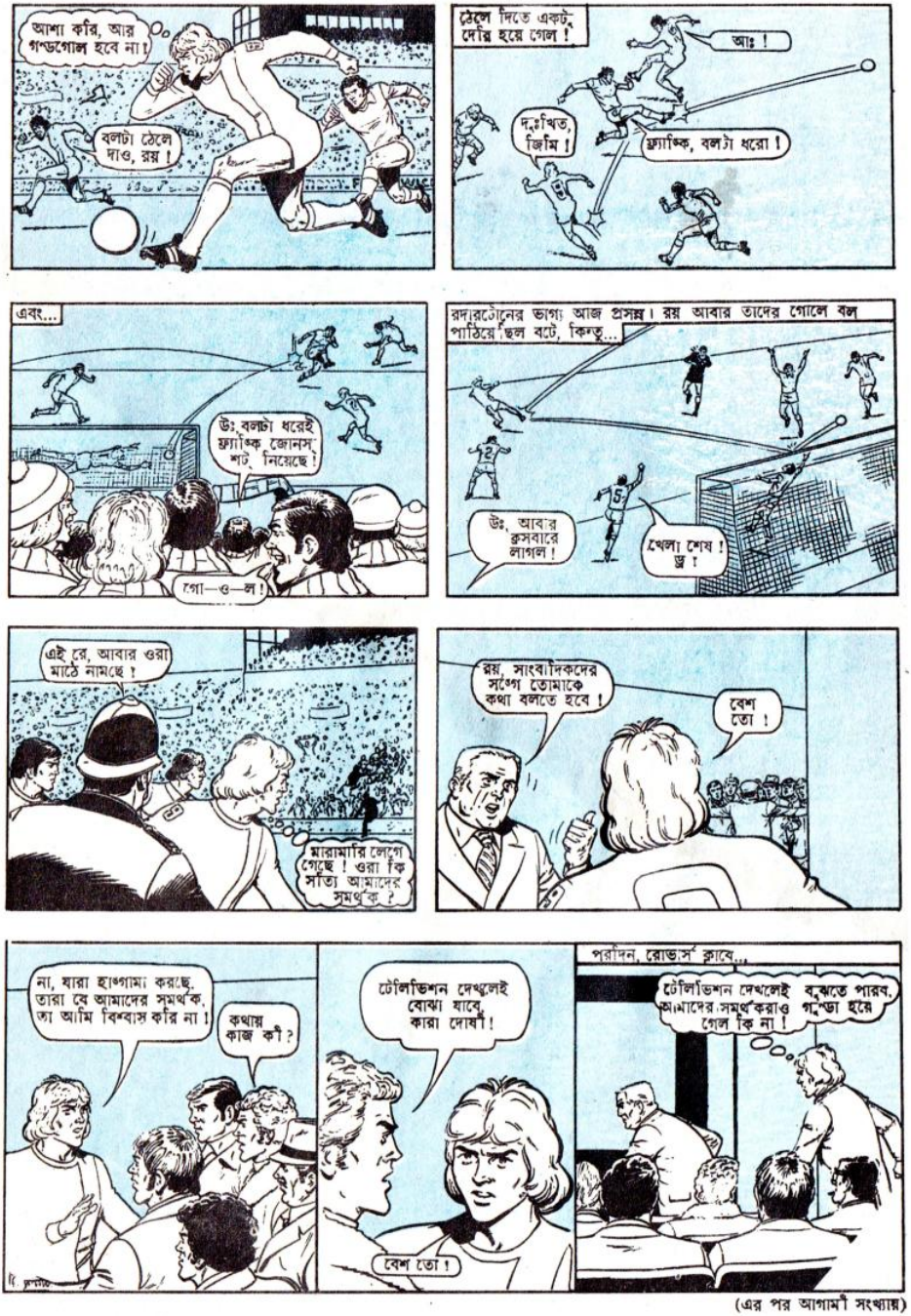

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

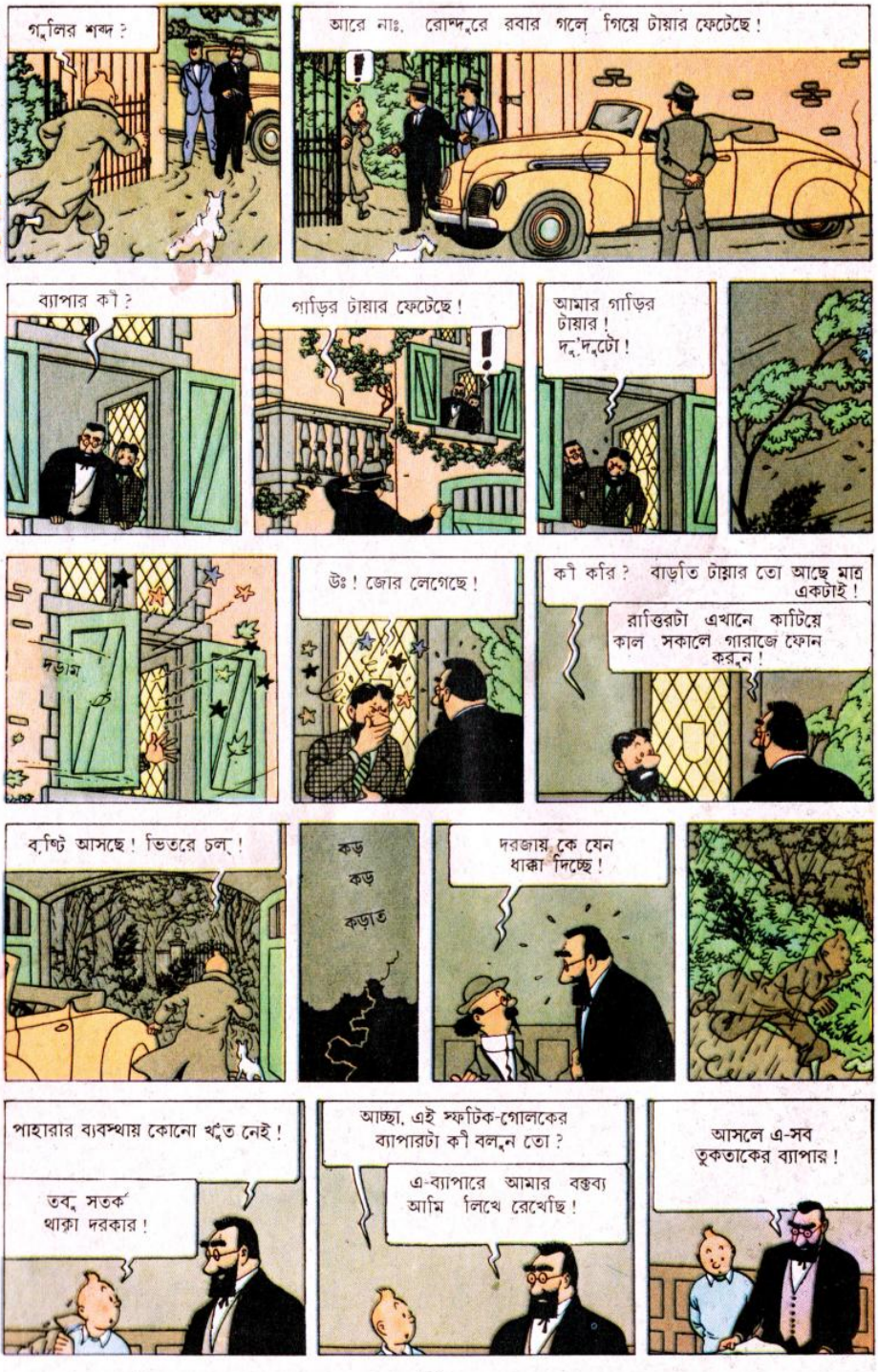
গুলির শব্দ ?
আরে নাঃ, রোদ্দুরে রবার গলে গিয়ে টায়ার ফেটেছে !
ব্যাপার কী ?
গাড়ির টায়ার ফেটেছে !
আমার গাড়ির টায়ার ! দু'দুটো !
দড়াম
উঃ ! জোর লেগেছে !
কী করি ? বাড়তি টায়ার তো আছে মাত্র একটাই !
রাত্তিরটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে গারাজে ফোন করুন !
বৃষ্টি আসছে ! ভিতরে চল্ !
কড় কড় কড়াত
দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে !
পাহারার ব্যবস্থায় কোনো খুঁত নেই !
তবু সতর্ক থাকা দরকার !
আচ্ছা, এই স্ফটিক-গোলকের ব্যাপারটা কী বলুন তো ?
এ-ব্যাপারে আমার বক্তব্য আমি লিখে রেখেছি !
আসলে এ-সব তুকতাকের ব্যাপার !

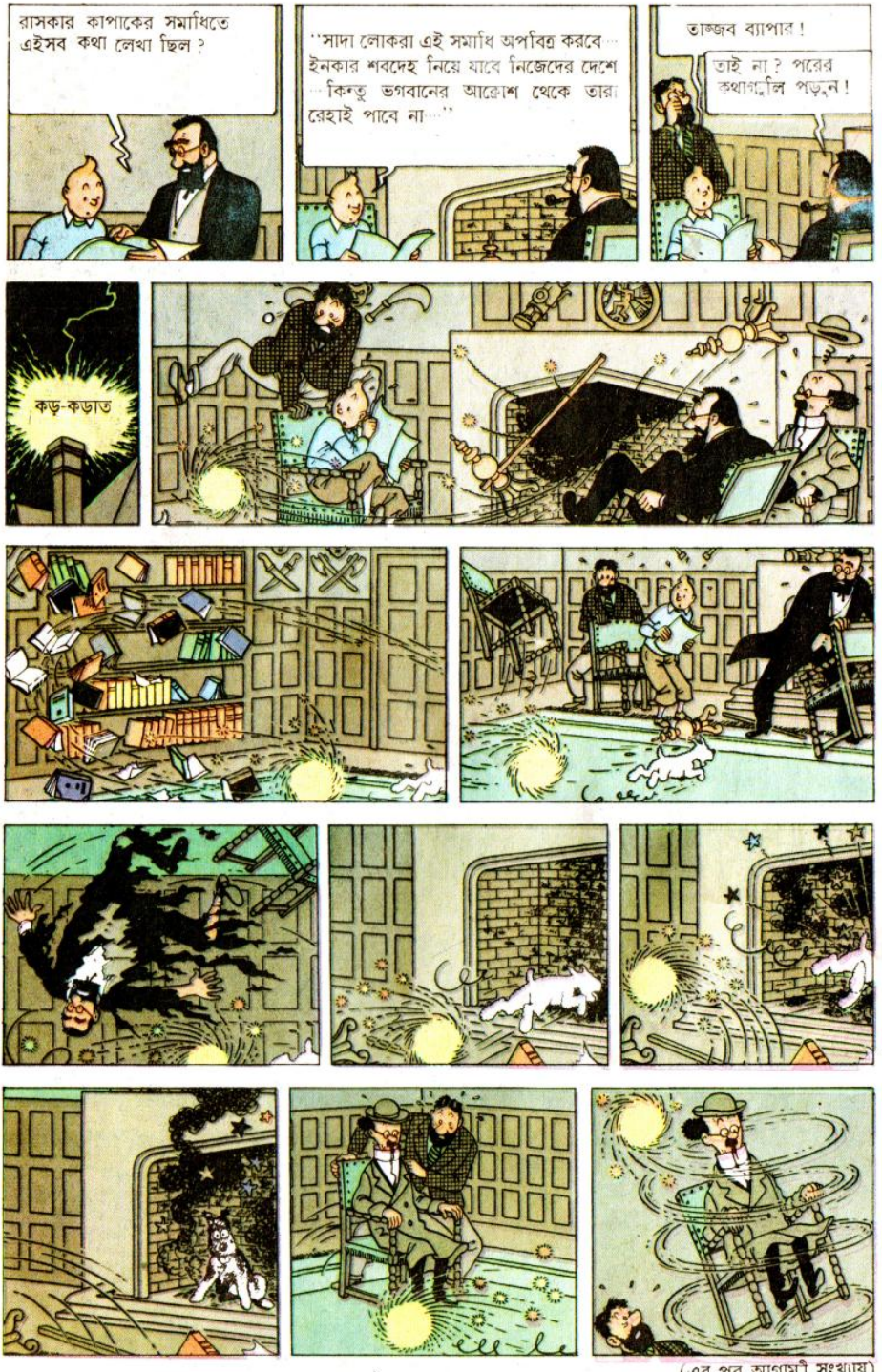

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

সচিত্র ধারাবিবরণী

বিশ্বকাপ ফুটবল

ফরাসীরা সেবারে তিন গোলে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডকে হারায়।

স্টকহোমের একটি কাগজ মন্তব্য করে : ফ্রান্সই এবারে বিশ্বকাপ জিতবে !

ফরাসী খেলোয়াড়দের স্ত্রীরাও চলে আসেন স্টকহোমে !

পরের খেলা ফ্রান্স বনাম ব্রাজিল। ব্রাজিলের টীম ছিল এইরকম :

চব্বিশে জুন খেলার শুরুতেই ভাভা গোল দেন।

সেই গোল শোধ করেন ফ'তাইন।

তারপরে জ'কে জখম। সেই সুযোগে ডিডি দেন আর-একটি গোল।

ব্রাজিলের ডিফেন্স দুর্ভেদ্য। ফরাসীরা তাই হতাশ হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে····

নতুন খেলোয়াড় পেলে মাত্র পনর মিনিটে আর তিনটি গোল দেন।

শেষ গোল দেন ফ্রান্সের পিয়াতোনি। ৫—২ গোলে ব্রাজিল জেতে।

অন্য সেমিফাইনাল সুইডেন খেলছে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে।

সে-খেলায় পঃ জার্মানিই প্রথমে গোল দেয় ····কিন্তু····

শেষ পর্যন্ত জিতে যায় সুইডেন। ফাইনালে সুইডেন খেলবে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে।

দুই পরাজিত সেমি-ফাইনালিস্টের মধ্যে খেলায় ফ্রান্স সেবারে ৬—৩ গোলে পশ্চিম জার্মানিকে হারায়, আর····

সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে পুরস্কার পান ফ'তাইন !

মোট তেরোটি গোল দিয়েছিলেন তিনি।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

স্কাইল্যাব

আদিনাথ নাগ

ওরে বাবা! যদি পড়ে স্কাইল্যাবটা
ঘাড়ে বা মাথায়, তবে চিঁড়ে-চ্যাপ্‌টা।
মিঠু ভাবে ব্যাঙেরা তো সুখে থাকবে,
নিজেদের ছাতা আছে, মাথা ঢাকবে।
তার নেই ছাতা-টাতা, আছে রেন-কোট,
টুপিটা কি আটকাতে পারবে এ চোট?
হাবু ভেবে সারা—আজ কী হয় কী হয়,
ছাতা দিয়ে বাঁচবে না মাথা নিশ্চয়।
সারাদিন তাকিয়ে সে দূর আকাশে
খুঁজছিল—যদি কিছু ছিট্‌কে আসে।
অবশেষে দেখে এক শকুনি বা চিল
ছুটে এসে ঘরে ঢুকে এঁটেছিল খিল।
বঙ্কাটা শুধু ভাবে—কেমনে বাঁচি?
কোথায় পালাব—কাশী কিংবা রাঁচি।
বুদ্ধিটা খেলে গেল শেষে মাথাতে—
জায়গা তো আছে ভাল কলকাতাতে।
পাতাল রেলের আছে টানেল কত,
থাকা যাবে সেখানেই রাতের মতো।
পড়ুক না স্কাইল্যাব ঝুপ ঝাপ দ্রুম্‌,
থাকবে বঙ্কা তবু ঘুমেতে নিঝুম।
মিঠু হাবু বঙ্কারা সকলে যখন
স্কাইল্যাব-ভয়ে ভীত হচ্ছে, তখন
রেডিওতে ভেসে এল, বলেছে নাসা,
পড়বে না স্কাইল্যাব সর্বনাশা
ভারতের কোনোখানে স্থলে কি জলে।
হায় সব তোড়জোড় গেল বিফলে।
হতাশায় কাত্‌রিয়ে বলে বঙ্কা,
'যাব্বাবা! শেষে সেই লবডঙ্কা।'
মিঠু বলে, 'নাসা কেন গলাবে নাসা,
বসে আছি নিয়ে কত হৃদয়ে আশা।
দেখা আর হল না সে কেমন জিনিস,
স্কাইল্যাব হয়ে যাবে বিদেশে ফিনিশ।'
হাবু বলে, 'নাসা বড় বেশি বেরসিক,
ভারতে না-ফেলা, সেটা হচ্ছে না ঠিক।
খবরটা শুনে বড় পেলাম রে দুখ,
সবটা না পড়ে, বেশ, কিছু তো পড়ুক।'
দুম করে গুড়গুড় গর্জাল মেঘ,
চম্‌কে দাঁড়ায় সব, মহা উদ্বেগ।
বঙ্কা ও মিঠু হাবু ভয়েতে বেজায়
খাটের তলায় ঢুকে দারুণ চেঁচায়।
'বাঁচাও বাঁচাও' কাঁদে বুক চাপ্‌ড়ে,
ভারতেই শেষকালে! ওরে বাপ রে!

ছবি দেবাশিস দেব

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

পেলুসিডারের চাঁদ স্ফটিকে গড়া ! রক্তের সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলিও কাঁপছে ! চাঁদ সহসা খানিকটা সরে গেল ...

আর তারই ফলে ...

বাইরের পৃথিবীতে দেখা দিল ভয়ংকর আলোড়ন ! মাহাররা ঠিক এটাই চেয়েছিল !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সন্তু আর কাকাবাবু আবার একটা অভিযানে বেরিয়েছে। এবার হিমালয় পাহাড়ে, এভারেস্ট চূড়ার দিকে। ওরা এখন আছে গোরখশেপ নামে একটা জায়গায়। সেখানে চারদিকে শুধু বরফ আর একটা অনেক পুরনো গম্বুজ। সন্তু আর কাকাবাবু থাকে সেই গম্বুজে, তার বাইরের তাঁবুতে শেরপা আর মালবাহকরা। কাকাবাবু রোজ রাতে একটা দূরবিন চোখে লাগিয়ে বসে থাকেন গম্বুজের ওপরের দিকে। কাকাবাবু সঙ্গে এনেছেন একটা কাচের বাক্সের মধ্যে দাঁতের মতন একটা জিনিস। সেটা সব সময় তিনি সাবধানে আগলে রাখেন। সেটা কী, তা জানবার জন্য ছটফট করে সন্তু। তারপর—

৫

দুপুর থেকেই বরফ-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এখানে বৃষ্টি মানেই বরফ-বৃষ্টি, তবে এক-এক সময় খুব নরম, পাতলা পেঁজা-তুলোর মতন তুষারপাত হয়, তার মধ্য দিয়ে হাঁটতে বেশ আরাম লাগে, তাতে গা ভেজে না। আর এক-এক সময় তুষারপাতে আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, চার-পাঁচ হাত দূরের কোনো জিনিসও দেখা যায় না। সেই রকম বৃষ্টির মধ্যে হাঁটা-চলা করাও অসম্ভব।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করার পর থেকেই সন্তু গম্বুজের মধ্যে শুয়ে আছে। দিনের বেলাতেও এই গম্বুজের মধ্যে আলো খুব কম ঢোকে, তাই ব্যাটারি-লণ্ঠনটা জেবলে রাখতে হয়। সেই আলোতে কাকাবাবু তাঁর কালো রঙের খাতাটিতে খসখস করে কী সব লিখে চলেছেন।

মাঝখানে কাঠের বাক্সের ছোট টেবিলটিতে রাখা সেই চৌকো কাচের বাক্সটি, তার মধ্যে ভেলভেটের ওপর সাজানো সেই দাঁতের মতন জিনিসটা। সেটা দাঁত হতে পারে না। মানুষের দাঁতের মতনই আকৃতি, কিন্তু যে-কোনো মানুষের দাঁতের চেয়ে বোধহয় ছ' গুণ বড়। প্রায় দু' ইঞ্চি। মানুষ ছাড়া এরকম দাঁত অন্য কোনো প্রাণীর হয় না, আবার কোনো মানুষেরই এত বড় দাঁত হতে পারে না।

জুতোর দোকানের বাইরে এক-এক সময় একটা বিরাট ঢাউস জুতো সাজিয়ে রাখা হয়। মনে হয়, সেই জুতো কোনো মানুষের জন্য নয়, দৈত্যদের জন্য তৈরি। সেই রকম এই দাঁতটাও নিশ্চয়ই কেউ মজা করে বানিয়েছে।

সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সন্তুর অনেক সময় মনে হয়, জিনিসটার যেন রং বদলায়। কখনো মনে হয়, সেটা বেশ হলদেটে, কখনো মনে হয় ফটফটে সাদা, আবার, এক-এক সময় একটু লালচে ভাবও আসে যেন। সত্যিই কি রং বদলায়, না ওটা সন্তুর চোখের ভুল?

কাকাবাবু লেখা থামিয়ে পাইপ ধরাতে যেতেই সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আপনি দাঁতটার কথা বলবেন, বলেছিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আর বুঝি কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিস না? ভেবেছিলাম, তোকে আরও কয়েকদিন পরে বলব! আচ্ছা শোন্ তা হলে!"

পাইপে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এটা দেখে তোর কী মনে হয়? এটা মানুষের দাঁত?"

সন্তু একবার বলল, "হ্যাঁ।" তারপর বলল, "না!"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও, ঠিক তোরই মতন, কেউ বলেছেন, এটা মানুষের দাঁত। কেউ বলেছেন, তা হতেই পারে না! এটা নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়েছে। সে-সব কথা বলবার আগে, একজন লোকের কথা বলা দরকার। তাঁর নাম রাল্‌ফ ফন কোয়েনিংসওয়াল্ড। ইনি থাকতেন নেদার-ল্যাণ্ডসে, কিন্তু এঁর একটা শখ ছিল, যে-সব জীবজন্তু পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের নিয়ে গবেষণা করা। সেই জন্য তিনি পৃথিবীর বহু জায়গা ঘুরেছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষেও তিনি এসেছেন, চীনেও গেছেন। চীন দেশে, পিকিং শহরের রাস্তায়..."

সন্তু বাধা দিয়ে বলল, "এখন সেই শহরটার নাম বেইজিং!"

কাকাবাবু সন্তুর চোখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ থেমে রইলেন। তাঁর কথার মাঝখানে তিনি অন্য কারুর কথা বলা পছন্দ করেন না।

সন্তু তা বুঝতে পেরে অপরাধীর মতন মুখ করল।

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা বেশ, এখন

নাম বেইজিং। যখনকার কথা বলছি, তখন ১৯৩০ সাল, সেই সময় সবাই পিকিং-ই বলত। সে সময় ঐ পিকিং শহরের রাস্তায় একদল লোক নানারকম অদ্ভুত জিনিস বিক্রি করত। এরকম আমাদের দেশের রাস্তায়ও এখনো দেখা যায়। ফুটপাথে একটা কাপড় বিছিয়ে তার ওপর নানা রকম জীবজন্তুর হাড়, কঙ্কাল, ধনেশ পাখির ঠোঁট, এই সব বিক্রি করে। রালফ্ ফন কোয়েনিংসওয়াল্ড পিকিংয়ের রাস্তায় এক ফেরিওয়ালার কাছে নানারকম হাড় ও পাখির পালকের সঙ্গে এই রকম তিনটি দাঁত দেখতে পেলেন। দেখে তো তিনি স্তম্ভিত! এত বড় মানুষের দাঁত? ফেরিওয়ালাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই দাঁতগুলো কোথায় সে পেয়েছে? সে ঠিক উত্তর দিতে পারে না। সে খালি বলে, পাহাড় থেকে! কোয়েনিংসওয়াল্ড খুব কম দামে দাঁত তিনটি কিনে নিলেন।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"কী?"

"ফেরিওয়ালারা ঐ টুকরো-টুকরো হাড় আর কঙ্কাল বিক্রি করে কেন? ওগুলো কাদের কাজে লাগে? ডাক্তারি ছাত্রদের?"

"হ্যাঁ। ডাক্তারি ছাত্রদেরও কাজে লাগতে পারে। তা ছাড়া, অনেক লোকের ধারণা, সে-সময় চীনাদের খুবই বিশ্বাস ছিল যে, এই সব জিনিস গুঁড়ো করে খেলে অনেক রোগ সেরে যায়। কেউ-কেউ আবার বিশ্বাস করত যে, পুরনো দিনের শক্তিশালী প্রাণীদের হাড় গুঁড়ো করে খেলে শরীরের তেজ বাড়ে। এখনো যেমন অনেকের ধারণা, গণ্ডারের শিং খেলে শরীরে দারুণ তেজ হয়।"

"গণ্ডারের শিং মানুষে খায়?"

"হ্যাঁ। সেইজন্যই তো লুকিয়ে-লুকিয়ে গণ্ডার মারা হয়। গণ্ডার মারা এখন আইনে নিষেধ। তবু কিছু লোক লুকিয়ে-লুকিয়ে গণ্ডার মেরে তার শিংটা আরব শেখদের কাছে বিক্রি করে। এক-একটা শিং-এর দাম তিরিশ-চল্লিশ হাজার। আরবরা ঐ শিং কাঁচা-কাঁচাই খেয়ে ফেলে!"

"তারপর কোয়েনওয়াল্ড কী করলেন?"

"কোয়েনওয়াল্ড নয়, কোয়েনিংসওয়াল্ড। তিনি তারপর খোঁজ করে দেখলেন পিকিং, হংকং, জাভা, সুমাত্রা, বাটাভিয়ার অনেক ওষুধের দোকানেই এরকম দাঁত বিক্রি হয়। সেগুলোও বেশ বড় বড়, কিন্তু ঐ তিনটির মতন অত বড় নয়। লোকের দাঁতের অসুখ হলে ঐ দাঁত কিনে গুঁড়ো করে সেই গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজে, তাতেই সব অসুখ সেরে যায়। এত বড় বড় দাঁত কোন্ প্রাণীর, আর কোথায় এগুলো পাওয়া যায়, সেই খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলেন কোয়েনিংসওয়াল্ড। অনু-

বীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তিনি দেখলেন যে, ঐ দাঁত-গুলোর গোড়ায় একটু যেন হলদে হলদে ধুলো লেগে আছে। সেই ধুলো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, সেই রকম হলদে রঙের মাটি আছে ইয়াংসি নদীর ধারে পাহাড়ের কোনো-কোনো গুহায়। তখন তিনি ভাবলেন, ঐ দাঁত-ওয়ালা প্রাণীরা নিশ্চয়ই তাহলে এক সময় ঐ ইয়াংসি নদীর ধারের পাহাড়ের গুহাতেই থাকত। ঐগুলি যদি মানুষের দাঁত হয়, তা হলে সেই মানুষগুলো অন্তত কুড়ি-পঁচিশ ফুট লম্বা হওয়া উচিত। কিন্তু অত বড় লম্বা মানুষের কথা কক্ষনো শোনা যায়নি, প্রাগৈতি-হাসিক কালেও মানুষের মতন কোনো প্রাণী অত লম্বা ছিল না। যাই হোক, কোয়েনিংস-ওয়াল্ড সেই দাঁতওয়ালা কাল্পনিক প্রাণীদের নাম দিলেন জাইগ্যাণ্টোপিথিকাস। অর্থাৎ দৈত্যের মতন বন-মানুষ। পৃথিবীর অনেক বৈজ্ঞানিকই কিন্তু তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না।"

একটু থেমে কাকাবাবু পাইপ টানতে লাগলেন।

তারপর আবার বললেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন কোয়েনিংসওয়াল্ড জাভায় ছিলেন। তিনি বন্দী হলেন জাপানি-দের হাতে। তাঁকে আটকে রাখা হল একটা ব্যারাকে, তাঁর জিনিসপত্র সব কেড়ে নেওয়া হল। সেখানে থাকতে-থাকতে রোগা হয়ে গেলেন তিনি, মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেল, অনেকেরই ধারণা হল তিনি আর বেশি-দিন বাঁচবেন না। তাই যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন আগেই ছেড়ে দেওয়া হল তাঁকে। কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি যে, তিনি তাঁর কোমরে একটা ছোট্ট থলির মধ্যে বেঁধে সর্বক্ষণ নিজের কাছে রাখতেন কিছু মহামূল্যবান জিনিস। সে জিনিসগুলো আর কিছু নয়, ঐ তিনটে দাঁত।

"ছাড়া পাবার পর কোয়েনিংসওয়াল্ড নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে এলেন আমেরিকায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ক্লাবে একদিন দুপুরে তিনি কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে খেতে বসেছিলেন, কথায়-কথায় প্রাচীন-কালের মানুষদের প্রসঙ্গ উঠল। একজন অধ্যাপক ঠাট্টা করে বললেন, মিঃ কোয়েনিংস-ওয়াল্ড, আপনি সেই জাইগ্যাণ্টোপিথিকাসের খবর রটিয়ে দিয়ে আমাদের খুব চমকে দিয়ে-ছিলেন! দু' ইঞ্চি লম্বা দাঁত মানুষের মতন কোনো প্রাণীর হতে পারে? তা হলে তার মুখখানা কত বড় হবে?

"বুড়ো কোয়েনিংসওয়াল্ড এই কথা শুনে দারুণ চটে গেলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কী, হয় না? দেখবেন? প্রমাণ চান? তা হলে দেখুন।

"সামনেই খাবারের প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক পরিচারিকা। কোয়েনিংসওয়াল্ড কোমর থেকে সেই ছোট্ট থলিটা বার করে দাঁত তিনটে সেই খাবারের প্লেটের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, এগুলো তা হলে কী?

"অত বড় বড় দাঁত দেখে সেই পরিচারিকাটি 'ও মাগো!' বলে চিৎকার করে উঠল, তার হাত থেকে প্লেটটা পড়ে গিয়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল। পরিচারিকাটি সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান। ছুটে এল আরও অনেক লোক। দাঁত তিনটেও ছিটকে কোথায় চলে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে দুটো দাঁত পাওয়া গেল, একটা আর পাওয়া গেল না কিছুতেই। সেখানকার সব চেয়ার, সোফা, মেঝের কার্পেট উল্টেপাল্টে দেখা হল, কিন্তু একটা দাঁত যেন অদৃশ্য হয়ে গেল হঠাৎ। দাঁতের শোকে বুড়ো কোয়েনিংসওয়াল্ড কাঁদতে লাগলেন শিশুর মতন। তারপর বেশিদিন আর তিনি বাঁচেননি।"

সন্তু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এইটাই কি সেই তৃতীয় দাঁত?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "তোর বুদ্ধি আছে দেখছি। ঠিক ধরেছিস! হ্যাঁ, এটাই সেই তৃতীয় দাঁতটা। অন্য দুটো দাঁতের একটা আছে আমেরিকার 'মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি'তে। আর-একটা দাঁত কোয়েনিংস ওয়াল্ড নিজেই তাঁর মৃত্যুর আগে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু মাইকেল শিপটনকে। তাঁর ধারণা ছিল, ঐ দাঁত মানুষের সৌভাগ্য এনে দেয়। ঐ দাঁত সঙ্গে ছিল বলেই জাপানিরা তাঁকে মারেনি। তৃতীয় দাঁতটা ঐ হার্ভার্ড ক্লাবের এক পরিচারক চুরি করে। গোলমালের মধ্যে সে সেটা সরিয়ে ফেলেছিল চটপট। অনেকদিন পরে সে সেটা বিক্রি করেছিল সার আর্থার রকবটম নামে এক বৈজ্ঞানিকের কাছে। গতবার বিলেতে গিয়ে আমি স্যার আর্থারের ছেলে লেননের কাছ থেকে এই দাঁতটা ধার করে এনেছি। লেনন আমার অনেকদিনের বন্ধু।"

সন্তুর কাছে এখনো সব কিছু পরিষ্কার হল না। তাহলে এই দাঁতটা কিসের? দাঁতটা পাওয়া গিয়েছিল পিকিংয়ে, এখন সেটাকে নিয়ে এই নেপালে আসার মানে কী?

সে জিজ্ঞেস করল, "এই দাঁতটা তাহলে কি ইয়েতির, কাকাবাবু?"

NIRLEP

TEN YEARS IN THE SERVICE
OF INDIAN HOUSE-WIFE

With approved 'ICI' Hard Coat
and 'ISI' Marking

Sole Distributors:
ARYAN TRADERS
Dongre Building, Opp. Ruia College,
Matunga, Bombay 400 019.
Phone: 442176

Local Dealer :

M|S. AMAR NATH KUNDU & BROS.
14|3, Old China Bazar Street, Calcutta-700001, Phone: 26-7916

কাকাবাবু বললেন, "ইয়েতি বলে কিছু আছে নাকি? তুই ইয়েতি সম্পর্কে কী জানিস?"

"হিমালয়ের এই রকম উঁচু জায়গায় বরফের মধ্যে এক রকম মানুষ থাকে, তারা খুব হিংস্র—"

"কেউ তাদের দেখেছে?"

"অনেকেই তো দেখেছে বলে। অবশ্য কেউ তাদের ছবি তুলতে পারেনি। আমার মনে হয় এখানে ইয়েতি আছে, কারণ শেরপা নোরবু - ভাই বাচ্চা ইয়েতির মূর্তি বানাচ্ছিল!"

"তাই নাকি? দেখতে হবে তো। তুই লক্ষ করেছিস, সেই মূর্তির পায়ে কটা আঙুল?"

"তা তো দেখিনি। কেন?"

"সব জিনিস ভাল করে লক্ষ করতে হয়। ইয়েতির যে-সব পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়, সেই সব ছাপগুলোতেই কিন্তু পায়ের আঙুল মোটে চারটে। মানুষ তো দূরের কথা, গোরিলা কিংবা শিম্পাঞ্জি-দেরও পায়ে পাঁচটা আঙুল থাকে। পায়ে চারটে আঙুলওয়ালা মানুষের মতন কোনো প্রাণীর কথা কল্পনাও করা যায় না!

সন্তু চুপ করে গেল। এতখানি সে জানত না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "যদি ইয়েতি নামে বাঁদর বা ভাল্লুক জাতীয় কোনো প্রাণী থাকেও, সেগুলোও কিন্তু ছ' সাত ফুটের চেয়ে লম্বা নয়। যারা ইয়েতি দেখেছে বলে দাবি করে, তারাও কেউ বলেনি যে, ইয়েতি খুব লম্বা প্রাণী। সুতরাং এতবড় দাঁত ইয়েতির হতে পারে না!"

"তাহলে?"

"মহাভারতের ঘটোৎকচের কথা মনে আছে? সে এত লম্বা ছিল যে, কর্ণের বাণে সে যখন মারা যায়, তখন তার দেহের চাপেই মরে গিয়েছিল অনেক কৌরব-সৈন্য! রামায়ণ-মহাভারত পড়লে মনে হয়, এক সময় বনে-জঙ্গলে কিছু খুব লম্বা জাতের মানুষ থাকত, তাদের বলা হত রাক্ষস। হয়তো সেই রকম এক-আধটা রাক্ষস এখনো রয়ে গেছে!"

"এখনো?"

"স্যার আর্থার রকবটম এই দাঁতটা নিয়ে মাইক্রো-কার্বন পরীক্ষা করেছেন। তাঁর মতে, এটা দেড়শো-দুশো বছরের বেশি পুরনো নয়। অর্থাৎ এই দাঁত যার মুখে ছিল, সে দেড়শো-দু'শো বছর আগেও বেঁচে ছিল। স্যার আর্থারের মতে, এরা কোনো আলাদা জাতের প্রাণী নয়। সাধারণ মানুষই এক-দু'জন হঠাৎ খুব লম্বা হয়ে যেতে পারে, যদি তাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের গোলমাল দেখা দেয়।"

"আমরা সেইরকম কোনো লোককে খুঁজতে এসেছি এখানে?"

"না।"

"তবে?"

"আসল কারণটা এখন তোকে বলা যাবে না। যতক্ষণ না ঠিকমতন প্রমাণ পাচ্ছি, ততক্ষণ বলার কোনো মানে হয় না। তবে, আর-একটা কারণ আছে। তোকে বললাম না, বুড়ো কোয়েনিংসওয়াল্ড মৃত্যুর আগে একটা দাঁত দিয়ে যান তাঁর বন্ধু মাইকেল শিপটনকে। এই মাইকেল শিপটনের এক ছেলের নাম কেইন শিপটন। তুই তার নাম শুনেছিস?"

"না।"

"অনেকেই তার নাম জানে। বিখ্যাত অভিযাত্রী। বছর দু'এক আগে সব খবরের কাগজে কেইন শিপটনকে নিয়ে খুব লেখা-লিখি হয়েছিল। কেইন শিপটন একটা ছোট দল নিয়ে এসেছিল এভারেস্ট অভিযানে। এই গম্বুজটার কাছেই তারা তাঁবু ফেলেছিল। তারপর একদিন সন্ধেবেলা কেইন শিপটন এখান থেকে মাত্র দুশো তিনশো গজ দূরের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তন্ন-তন্ন করে তাকে খোঁজা হয়েছে, তার মৃতদেহের কোনো সন্ধানই মেলেনি, এই দ্যাখ কেইন শিপটনের ছবি।"

কাকাবাবু কালো খাতাটার ভেতর থেকে একটা ছবি দেখালেন সন্তুকে। খবরের কাগজ থেকে কাটা ছবি। একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের সাহেব, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ, তার গলায় হারের মতন কী যেন একটা ঝুলছে।

কাকাবাবু সেখানে আঙুল রেখে বললেন, "এই হারের একটা লকেটে কেইন শিপটন সব সময় রেখে দিত তার বাবার বন্ধুর দেওয়া দাঁতটা। সে ঐ দাঁতটাকে মনে করত সত্যিই একটা সৌভাগ্যের চিহ্ন। কিন্তু ঐ দাঁতটা বুকে ঝুলিয়ে এখানে এসেছিল বলেই বোধহয় কেইন শিপটনের প্রাণ গেল!"

(ক্রমশ)

যেন রূপকথা

কবিতা সিংহ

মানুষটার নাম নীলমণি।

কালোকোলো। ভালভুলো। সে হল মস্ত এক ঢালের মতন টিলার রাজা। রাজা তো রাজা, কিন্তু গরিব রাজা। দুঃখী রাজা।

অথচ নীলমণির টিলাটা নরম সবুজ ঘাসে ঢাকা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন আদ্যিকালের মস্ত একটা কচ্ছপের পিঠ। টিলার ঠিক মাঝখানটিতে ঝুরি নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা আদ্যিকালের বটগাছ।

নীলমণি সেই গাছের পেটের ভিতর গভীর একটা কোটরে থাকত। তার সঙ্গে থাকত তার বৌ সুবাসী। ওরা ফলের সময় পেট ভরে খেত বনের ফল আর নদীর জল।

খরার সময় শীতের সময় কিন্তু নীলমণি আর সুবাসীর বড় কষ্ট হত।

ক্রমে ক্রমে চারচারটি খোকা-খুকু হল তাদের। বটগাছের কোটরে আর তাদের ধরে না। তাই খোকাখুকুদের গরম আর শুকনো কোটরে রেখে নীলমণি আর সুবাসী বট-তলাতেই রোদ গ্রীষ্ম শীত কাটাত।

কিন্তু সেজন্য তারা দুঃখ করত না। কারণ ছেলেমেয়েদের জন্য বাবা-মা সব রকমের দুঃখ-কষ্টই হাসিমুখে সহ্য করতে পারে।

তাই নীলমণি আর সুবাসী উদয়াস্ত খাটে। খাটা মানে ফল আনা, কন্দ আনা—শুকনো লাউয়ের খোলায় জল আনা। ওদের টিলার এক পাশে বন, এক পাশে নদী আর এক পাশে মস্ত ফুলের অঞ্চল। টিলার ওপর থেকে কী সুন্দর যে দেখতে লাগে!

নীলমণি-সুবাসীর ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের কষ্ট বোঝে না। তারা ভোরে উঠেই খেয়ে দেয়ে ফুলবনে খেলতে চলে যায়, রাতে চাঁদের আলোয় টিলায় বসে মা-বাবার কাছ থেকে সূর্য চাঁদ তারা বন পাহাড় নদী আর ফুল-বনের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। এমনি করেই দিন যায়। নীলমণি আর সুবাসীর স্বাস্থ্য ভাঙে, খাটুনির চোটে তারা ঝুঁকে পড়ে। ছেলেমেয়েরা যত বড় হয় তাদের খিদে বাড়ে, তাদের তেষ্টা বাড়ে, তাদের আর ছোট্ট কোটরে ধরে না।

একদিন খিদেয় জ্বলতে জ্বলতে রেগে-মেগে বড় ছেলেটা বলল, "ধুত্তোর, বিচ্ছিরি এই দেশটা! আমি পাহাড়ের ওপারে চলে যাব।"

মেজ ছেলে বলল, "আমিও যাব বন পেরিয়ে।"

সেজ বোনটি বলল, "আমি নদীর তীর ধরে যেদিকে দু চোখ যায় পালাব।"

ছোট বললে, "আমিও যাব তোর সঙ্গে সঙ্গে।"

পাহাড় পেরোতেই জিভ বেরিয়ে গেল বড় ছেলের। কাঠুরেদের ডেরা। ফুলবাগান নেই, খেলা নেই, কেবল কাজ। কাজ না করলে খাওয়াও নেই। চোখ বড়-বড় করে সে দেখল, তারা বাঁশের নলে জল রাখে। কাঠের বাড়িতে থাকে, শিকার করে আগুনে মাংস ঝলসে খায়। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি লোহার কুড়ুল দিয়ে কেটে কেটে নীচে নিয়ে যায়। বদলে আনে নুন, চামড়ার পোশাক, গমের ছালা। তাদের সঙ্গে

থাকতে থাকতে বড় ছেলে শিখল, কাজ হল লক্ষ্মী। আগুন হল সোনা। লোহা হল মণি।

এমনি করে বছর ঘুরে এল। একদিন রাতে বড় ছেলে তার বাবা-মাকে দেখল স্বপ্নে।

পরদিন সকালে উঠেই সে বলল, "আমি দেশে যাব।"

কাঠুরেরা বলল, "তা, যাও!"

যাবার সময় সে মাইনে হিসেবে পেয়ে গেল একটি কুড়ুল, এক জোড়া চকমকি আর বাবা-মায়ের জন্য চামড়ার জামা।

মেজ ভাইটি বন পেরিয়ে চলল তো চললই। বনের শেষে চমৎকার শিমুল কাপাসের বাগান। ফট্ ফট্ ফল ফাটছে, তুলোর সাদা আর সোনালি বল উড়ছে হাওয়ায়। কাছেই তাঁতি-পাড়া। তুলো আনছে বোঝাই করে। ধুনছে, বাছাই করছে, সুতো কাটছে, তাঁত বুনছে।

কিন্তু তাঁতিপাড়ায় বসে থাকার কোনো ব্যাপার নেই। কাজ করো আর খাও। দিনের শেষে, মেজ ভাই অবাক হয়ে দেখে—কত কাজ করেছে সে। কত তুলো ধুনেছে, কত সুতো কেটেছে, কত কাপড় ছুপিয়েছে। আবার চাষের সময় সে দেখল কী করে লাঙল চলে, বীজ বোনা হয়, ধান হয়, গম হয়। গরম-গরম রুটি, আর নরম-নরম ভাত। বছর পেরোল কাজ শিখতে।

তারপর একদিন ফাগুন মাসে নিমগাছ নিমফুলে ঝুরো ঝুরো হয়ে উঠতেই, চাঁদের আলোয় তার চোখে জল টলটল করে উঠল। আহা, শুকনো পাতার রাশি গায়ে দিয়ে ছোট্ট-মোট্ট হয়ে শুয়ে থাকে তার বাবা-মা, আর তার ভাইবোনেরা। মনে পড়তেই সে বলল, "দেশে যাব।"

তাঁতিমায়েরা চোখের জল চোখে রেখে বলল, "যা বাছা ঘরের ছেলে, ঘরে যা।"

মেজ ভাই চলল।

এক কাঁধে তার বীজের থলি, তাতে আছে ধান গম, তুলোর বীজ আর ডাল সরষে। আর এক কাঁধে তার চরকা আর তাঁতের কাঠি।

নদী ধরে হাঁটতে হাঁটতে ছোট বোনটির খিদে পেল। মউলেরা যাচ্ছিল চাক-ভাঙা মধু নিয়ে। বলল, "মধু খাবে?"

বড় বোন আর ছোট বোন মধু খেল। খেয়ে বলল, "বাঃ!"

ছোট বোন বলল, "দিদি রে, আমাদের টিলাতেও তো এমন চাক আছে। বাবা-মা কাছে যেতে দেয় না।"

মউলেরা বলল, "কী সুন্দর সোনার খুকু, রুপোর খুকু—বেশ তো। থাকবে আমাদের কাছে? মধু খাবে, দুধ খাবে। আর কুমোর-পাড়ার মাটির কাজ করবে?"

বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটি মাথা নাড়ল। মধুপাড়া দেখল তারা। মাটি ছেনে বানাতে শিখল হাঁড়ি পাতিল। কলসি ফুলদানি। বছর ঘুরতেই তুলি দিয়ে পট আঁকতে শিখল। আর পট আঁকতে শিখেই বড়টি আঁকল তাদের টিলার বটগাছটা। ছোটটি আঁকল দুধলি ফুল। সেদিন রাতে দুই বোনে গলা জড়াজড়ি করে কাঁদল মা-বাবা ভাইবোনদের কথা মনে করে।

সকাল হতেই তারা বলল, "ফিরে যাব।"

মউলেরা, কুমোরেরা বলল, "তা যাও। আটকাব কী করে?"

কিন্তু তাদের চোখ ছলছল করে উঠল।

কী মিষ্টি এই দেশে ফিরে আসা।

কী সুন্দর এই টিলার দেশ।

কী ভাল এই টিলার রাজা, টিলার রানী। আমাদের বাবা আর মা।

মস্ত উঁচু বটগাছের পাশে এখন খট্ খট্ খট্ খট্ ঘর উঠছে নীলমণির। বড় ছেলে বানাচ্ছে। নীচে নদীর ধারে মাটি ছানছে ছোট মেয়ে, পাত্তর বানাচ্ছে বড় মেয়ে। নীল-মণি কাঠিকুটি নিয়ে ধোঁয়া দিতে শিখেছে মৌচাকে। মেজ ছেলে বর্ষায় ধান বুনেছিল। টিলার একদিক এখন সোনালি হলুদ। তুলো-গাছগুলি উঁচু-উঁচু মাথা তুলেছে। তাঁতঘরটি বসল বলে। চকমকি জেবলে আগুন করে রান্না বসিয়েছে সুবাসী। সারাদিন কাজের পরে বিকেলবেলা ফুলবনে খেলা, আরও মধুর লাগে।

সন্ধেবেলা আগুনের পাশে বসে ভিন-দেশের গল্প খুব রঙিন লাগে।

কিন্তু সবার শেষে হেসে কেঁদে চার ভাইবোনই বলে, কী সুন্দর আমাদের এই টিলার দেশ! সবচেয়ে সুন্দর!

আর বাবা-মা বলে, "কত দেশের কত জিনিস শিখে এসে তোমরা এই টিলার রাজ্য আরও কত সুন্দর করেছ সোনারা — তোমরা সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে।"

শব্দ-সন্ধান

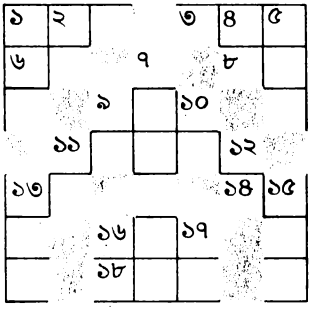

সংকেত : পাশাপাশি : (১) এমন মিষ্টি জিনিসেরও আবার ছুরি হয়! (৩) এই নাম দুবার উচ্চারণ করলেই বুঝব তুমি ঝগড়া বাধানোর পক্ষপাতী। (৬) কর্ণিকার ফলের বীজ। (৮) ক্রুর প্রাণী হিসেবে যাদের কুখ্যাতি সবচেয়ে বেশি। (৯) ভারতের কোন্ নদী দুটি বিখ্যাত হ্রদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে? (১১) যে-সব পর্তুগীজ শব্দ বাংলা হয়ে গেছে তাদের একটি। (১৩) কৃষিজাত ফল। (১৪) পার্বত্য জাতি। (১৬) বিখ্যাত শৈলনিবাস। (১৮) দেওয়াল।

উপর-নীচ : (১) কলকাতার বুকেও একটি আছে, তবে নাম পালটে গেছে। (২) কিরণ। (৪) পারদ। (৫) নিজের মুখোমুখি হতে চাও তো ওকে লাগবেই। (৭) মুখে আঁকা ছবি। (৯) জলাশয়। (১০) অভিমত। (১১) মুখ। মুখের গহ্বর বোঝাতেই প্রয়োগ বেশি। (১২) ভারতের একটি আঞ্চলিক রাজকীয় উপাধি। (১৩) ধীর গতির জন্য যে-প্রাণী খুব বিখ্যাত। (১৫) ইনি সব সময় নিজের চোখ বেঁধে রাখতেন। (১৬) মধ্য ভারতের বিখ্যাত এক নদীর বিখ্যাত উপনদী। (১৭) উলটে নিলে ছবি আঁকতে লাগে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান ➡

ধাঁধা

ধাঁধা নেব বলে বিকেল থেকে ছটফট করছি। কিন্তু ছোট্কার সময়ই হচ্ছে না। চার বন্ধু এসেছে ছোটকার, সঙ্গে চার স্ত্রী। গল্প-গুজব চলছে তাদের সঙ্গে।

বন্ধুরা অবশ্য সবাই ছোট্কার অফিসের। দু দিন জ্বরের জন্য অফিস যায়নি ছোট্কা। শনিবার সন্ধেবেলা চার বন্ধু সস্ত্রীক এসে হাজির। ছোট্কাকে আজ বেশ সুস্থই বলা যায়। ফলে, আড্ডা চলছে জমিয়ে।

মাঝে ছোড়দি আর মা চা-জলখাবার দিতে ওপরে গিয়েছিল। ওরাও বসে পড়েছে। যা দেখছি,

আজ আর ধাঁধা পাবার আশা নেই।

হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, এমন সময় ছোড়দি নেমে এল। আমার হাতে ধাঁধার খাতা আর মুখে হতাশার ছাপ দেখে ছোড়দির কী মনে হল কে জানে। বসে পড়ল সামনের চেয়ারটায়। তারপর বলল, "আমি একটা ধাঁধা দিতে পারি তোকে।"

আমি অবিশ্বাসের সুরে বললাম "ঠাট্টা করিস না ছোড়দি। ভাল্লাগে না।"

ছোড়দি বলল, "ঠাট্টা না রে, ছোট্কা যেভাবে আলাপ করিয়ে দিল ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে, তা সত্যি ধাঁধার মতন। তুই লেখ বরং, আমি মনে থাকতে-থাকতে বলে যাই।"

কী করি, ছোড়দির ধাঁধাটাই শেষ পর্যন্ত লিখে ফেললাম। লেখার পরে মনে হচ্ছে, বেশ ধাঁধা-লাগানোই ব্যাপারটা। তোমরা দেখো তো, উত্তর করতে পারো কি না!

প্রথম ধাঁধা। চার ভদ্রলোকের পরিচয় পদবী নিয়ে। মিঃ নন্দী, মিঃ হালদার, মিঃ বসু আর মিঃ জানা।

সঙ্গের ভদ্রমহিলা চার জনের নাম দেবী, বাণী, যূথিকা আর নমিতা। এঁরা ভদ্রলোকদের স্ত্রী। তবে কে কার স্ত্রী, সেটা বার করতে হবে।

এঁদের মধ্যে একটি দম্পতির নামের সঙ্গে পদবীর মিল রয়েছে। দুটির প্রথম অক্ষর এক। ভেঙে বলতে গেলে বলতে হয়, স্বামীর পদবী যে-অক্ষর দিয়ে আরম্ভ, স্ত্রীর নামও সেই অক্ষর দিয়ে শুরু।

মিঃ হালদারের স্ত্রীর নাম যূথিকা।

দেবী মিঃ জানার স্ত্রী নন, মিঃ নন্দীরও নন।

কে কার স্ত্রী?

দ্বিতীয় ধাঁধা। বেমানান শব্দ-টিকে খুঁজে বার করো--

কুবলয়, তামরস, কোকনদ ইন্দীবর, রাজীব, পুষ্কর, কর্পিঞ্জল, পুণ্ডরীক।

তৃতীয় ধাঁধা। চারটে তিন দিয়ে দশ লিখতে পারো? যে-কোনো চিহ্ন — যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ইত্যাদি বসানো যাবে।

চতুর্থ ধাঁধা। উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

২ ৩ ৮ — ৩৯৬৮

গতবারের উত্তর। ১। ২০ টাকা ব্যাটের দাম। বল ৫ টাকা করে একেকটা। ২। দুটো তরমুজ, ৬টা আম, ৮টা কলা (অন্য উত্তরও হয়) ৩। খাটিয়া ৪। অর্ধেকটা। কেননা, তারপর তো বেরোতে থাকবে।

সত্যসন্ধ

কা	গ	জ			রা	বা	র	
ম্পি		গ			জ		কি	
য়া		দ্দ			ভো		প	
ন	কু	ল			গ	ন্ধ	র্ব	
সা			কুঁ				ত	
গ		চাঁ	দো		য়া		মা	
র	ন	পা			কা	ম	লা	

কিসের ফোটো

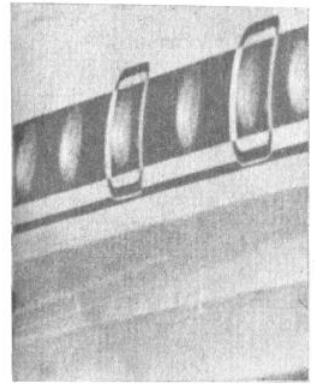

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ডাইভিং বোর্ড থেকে জলে ঝাঁপিয়ে-পড়া তিন সাঁতারুর ছবি ফোটো তপন দাস

উত্তর বটে

প্রঃ খরগোশ আর কচ্ছপের রেসে নিয়ম-কানুন কী?

উঃ খরগোশকে ফিনিশিং টেপ-এর কাছাকাছি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

প্রঃ বাঙালরা যাকে Polar Bear বলে, ঘটিরা তাকে কী বলবে?

উঃ ছেলের বিয়ের।

প্রঃ কোন্ নগর, এই প্রশ্নের উত্তর কোথায় গেলে পাওয়া যাবে?

উঃ বোধহয় উত্তরপাড়াতে।

প্রঃ কোন্ দেশের কিছুই চাইবার কথা নয়?

উঃ চায়না।

প্রঃ কোন্ জায়গায় জিনিসপত্রের দাম খুব চড়া?

উঃ ঘানার রাজধানী আক্রা-য়।

প্রঃ সুকুমার রায় কোন্ আনাজের সঙ্গে কোন্ রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে দিব্যি এক কবিতা বানিয়েছেন?

উঃ কুমড়োর সঙ্গে পটাশ মিশিয়ে।

সুসেন

মজার খেলা

ছটা মাত্র গ্লাস লাগবে এই খেলাটায়। তিনটে গ্লাস থাকবে জলে ভর্তি, তিনটে থাকবে খালি।

জলভর্তি গ্লাস তিনটে থাকবে পরপর। তার পাশে খালি গ্লাস তিনটেও পরপর থাকবে। অর্থাৎ খেলার শুরুতে গ্লাসগুলো সাজানো থাকবে এই রকম—

ক খ গ ঘ ঙ চ

এইবার তুমি বন্ধুদের ডেকে বলো, একটি মাত্র গ্লাস একবার হাতে তুলে নিয়ে এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে খালি গ্লাস আর জল-ভর্তি গ্লাস একান্তর ভাবে থাকে। একান্তর মানে হল, একটি খালি গ্লাসের পাশে ভর্তি গ্লাস, ফের খালি, ফের ভর্তি—এই রকম। অর্থাৎ পাশাপাশি দুটো গ্লাস খালি কিংবা দুটোই ভর্তি এমন যেন না থাকে। সময় দেবে এক মিনিট।

এক মিনিটের মধ্যে যদি কেউ পারে, তাহলে সে নিশ্চয়ই জিতে যাবে। না পারলে তুমি করে দেখিয়ে দেবে।

তুমি কী করবে, সেটা শিখে নাও।

'খ' গ্লাসটা হাতে তুলে নাও। এবার 'ঙ' গ্লাসটায় 'খ' গ্লাসের জলটা ওপর থেকে ঢেলে নিয়ে ফের 'খ' গ্লাসটাকে পুরনো জায়গায় রেখে দাও। তাহলেই দেখবে, একটা ভর্তি, একটা খালি—এইভাবে গ্লাসগুলো রয়েছে।

ক খ গ ঘ ঙ চ

খুব সোজা, অথচ খুব মজার খেলা। তাই না?

মজারু

হাসিখুশি

রামবাবু নবনিযুক্ত গৃহভৃত্যের বুদ্ধিশুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বল তো, কোনো একটা জিনিসের দাম যদি তিন টাকা আশি পয়সা হয় আর তুমি কিনে আনো চার টাকা তিরিশ পয়সায়, তুমি ঠকলে না জিতলে?"

গৃহভৃত্যটি নির্বিকারভাবে জবাব দিল, "কিছুটা ঠকলাম আবার বেশ কিছুটা জিতলাম।"

রামবাবু অবাক হয়ে বললেন, "মানে?"

গম্ভীর হয়ে চিন্তাশীল মুখে গৃহভৃত্যটি বলল, "টাকায় অল্প ঠকলাম, কিন্তু পয়সায় অনেক জিতলাম।"

নতুন চাকুরিপ্রার্থীকে নিয়োগ-কর্তা বললেন, "আপনার তো দেখছি কোনো প্রাক্তন অভিজ্ঞতা নেই কাজে, আপনি সে তুলনায় অত্যন্ত বেশি মাইনে চাইছেন।"

চাকুরিপ্রার্থী বললেন, "আজ্ঞে, অভিজ্ঞতা নেই বলেই তো বেশি মাইনে চাইছি।"

নিয়োগকর্তা অবাক হয়ে বললেন, "সে কী-রকম?" চাকুরি-প্রার্থী করুণভাবে জানালেন, "বুঝতেই তো পারছেন কোনো অভিজ্ঞতা নেই বলে অন্যদের তুলনায় আমাকে কত বেশি খাটতে হবে একই কাজে। সুতরাং—"

ছবি অহিভূষণ মালিক

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ২৬ ॥

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের শেষ সোনা জয়ের মূলে যাঁর অবদান ছিল অনেকখানি, আজ কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর কথা স্মরণ করছি। তিনি কিন্তু কোনো খেলোয়াড় নন—ভারতের একজন বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা এবং এক সময়ের কিংমেকার।

আমি শ্রী অতুল্য ঘোষ এবং বাষট্টির জাকর্তা এশিয়ান গেমসের কথা বলছি। তখন ভারতের বিদেশী অর্থ-ভাণ্ডার প্রায় শূন্য। তাই কোনো ক্রীড়া-দলের বিদেশ সফরের কথা উঠলেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক আপত্তি জানাতেন। এশিয়ান গেমসের জন্য ইন্দোনেশিয়ায় বড় আকারের দল পাঠানোর ব্যাপারেও আপত্তি উঠল।

দল গড়া হয়ে গেছে। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং ফুটবল ফেডারেশন ইন্দোনেশিয়ায় দল পাঠাবার ছাড়পত্রের জন্য দিল্লিতে ঘন ঘন দরবার করছেন। কিন্তু কিছুতেই অনুমতি মিলছে না।

ঠিক এই সময় অতুল্যদা দিল্লিতে গিয়ে দেখা করলেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে। তাঁকে বললেন, এশিয়ান গেমসের জন্য দল গড়া হয়ে গেছে। কঠোর অনুশীলনের পর ছেলেরা সব প্রস্তুত হয়ে বসে আছে, অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে প্রত্যাশা নিয়ে দিন গুনছে। সব উদ্যোগ কি ব্যর্থ হয়ে যাবে?

প্রধানমন্ত্রী নেহরু সব চুপ করে শুনে অর্থমন্ত্রীর কাছে দরবার করতে অতুল্যদাকে পরামর্শ দিলেন। তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন মোরারজি দেশাই। এক কথার শক্ত মানুষ। কোনো ব্যাপারে একবার 'না' করলে তাঁকে দিয়ে 'হ্যাঁ' করানো কঠিন কাজ। অতুল্যদা কিন্তু মোরারজিভাইকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমাদের ছাড়পত্র আদায় করেছিলেন। মোরারজিভাইকে তিনি বলেছিলেন, "আমার মনে হচ্ছে ছেলেরা ভাল ফল করবে। তাছাড়া বিদেশী মুদ্রার যত টানাটানিই থাক, এশিয়ান গেমসে ভারত যদি যোগ না দেয়, তবে অন্যান্য দেশের চোখে ভারতের দৈন্যের ছবিটাই তো বেশি করে ফুটে উঠবে।

ওই কথাতেই বোধহয় অর্থমন্ত্রী নরম হয়েছিলেন। এক সুন্দর সকালে খবরের কাগজ খুলে আমরা দেখলুম ভারত সরকার ভারতের গোটা দলটিকেই জাকর্তা যাবার অনুমতি দিয়েছেন। পর্দার অন্তরালে কী ঘটেছিল, উঁচু মহলে কী কথাবার্তা হয়েছিল, তখন তা আমাদের জানার সুযোগ ছিল না। পরে সব শুনেছি এবং বিশেষভাবে সব কিছু জেনেছি 'কষ্টকল্পিত' শিরোনামে 'দেশ' পত্রিকায় অতুল্যদার নিজের লেখা পড়ে।

জাকর্তায় সোনা জয় নিয়েই তোমাদের এই 'আনন্দমেলা'য় আমার আত্মজীবনী শুরু করেছি। এশিয়ান গেমসের খেলা সম্পর্কে প্রথমেই সব কিছু লিখছি। নতুন করে লেখার প্রয়োজন নেই।

খেলোয়াড়-জীবনে বার বার দেখেছি, আমরা যারা মাঠে নেমে খেলায় জিতেছি, বা জিতে ট্রফি পেয়েছি, তাদের চেয়েও ঢের বেশি আনন্দে মেতে উঠেছেন সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা। এশিয়ান গেমসে ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় এবং সম্ভবত দল পাঠানোর ব্যাপারে তাঁর কিছু অবদান থাকায় অতুল্যদার চোখে-মুখেও দেখেছিলুম শিশুসুলভ আনন্দের অভিব্যক্তি। গভীর রাতে দমদম বিমানবন্দরে নেমে সামান্য কিছু খেলা-পাগল উৎসাহীদের মধ্যে অতুল্যদাকে দেখে আমরা যেমন বিস্মিত হয়েছিলাম, তেমন আনন্দেরও অন্ত ছিল না। কর্মবহুল রাজনৈতিক জীবনের শতকাজের মধ্যেও অতুল্যদা ফুটবলে রীতিমত আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। আই এফ এ-র দুঃসময়ে তার হাল ধরেছিলেন সভাপতির পদ গ্রহণ করে।

ছোট একটা ঘটনার কথা তোমাদের বলছি। পঁয়ষট্টি সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালের ঘটনা। অতুল্যদা তখন আই এফ এ-র সভাপতি। ফাইনাল খেলবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। খেলার তারিখ নিয়ে ইস্টবেঙ্গল আপত্তি জানাল তাদের কয়েকজন খেলোয়াড়ের

শীল্ড-বিজয়ের পরের সেই আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্ত

চোট থাকায়। হাতে সময় বেশি ছিল না বলে আই এফ এ ফাইনাল খেলার তারিখ বদলাতে রাজি হল না। প্রতিবাদে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও ফাইনাল খেলার দিন মাঠে হাজির হল না। মোহনবাগান ক্লাব 'ওয়াক ওভার' পেল। আই এফ এ থেকে ঘোষণাও করা হল মোহনবাগান পঁয়ষট্টি সালের শীল্ড-বিজয়ী।

অতুল্যদা সভাপতি হলেও আই এফ এ-র দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু শীল্ড ফাইনাল খেলায় ওয়াক ওভার পেয়ে জয়ের ব্যাপারটিতে তিনি খুশি হতে পারলেন না। আমাদের মোহনবাগান ক্লাবের ধীরেনদাকে ডেকে বললেন, "ওহে ধীরেন, না খেলে জয় আবার কেমন জয়? তাও শীল্ড ফাইনালে? এতে কি তোমাদের ক্লাবের গৌরব বেড়েছে? তোমরা রাজি থাকো তো আমি চেষ্টা করতে পারি ফাইনাল খেলাটি যাতে হয়।" ধীরেনদা রাজি হয়ে গেলেন। ফাইনাল খেলাও হল। সে খেলায় কিন্তু মোহনবাগানকে হারিয়ে শীল্ড জিতল ইস্টবেঙ্গল।

খেলাকে প্রকৃত খেলা হিসাবেই নিয়েছিলেন অতুল্য ঘোষ। এত প্রতিষ্ঠা, এত সম্মান, এত শ্রদ্ধা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখন তো ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলার মধ্যেই ডুবে আছেন বিধান শিশুউদ্যানে। জাকর্তা থেকে ফিরে আসার পর চৌরঙ্গির কংগ্রেস ভবনে অতুল্যদাই আমাদের সংবর্ধনার এক বিপুল আয়োজন করেছিলেন। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ওই সভায় বলেছিলেন, "এশিয়ার ফুটবলে ভারত আজ শ্রেষ্ঠের শিরোপা পেয়েছে। তোমাদের জন্যই এই সম্মান। তোমাদের কৃতিত্বে আমরাও গর্বিত।"

ইন্দোনেশিয়ায় যখন এশিয়ান গেমস চলছিল তখন কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মধ্যে হয়েছিল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলা। বলা যেতে পারে লীগের ফাইনাল খেলা। সে বছর ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান লীগ টেবলের শীর্ষে ছিল সমান পয়েন্ট সংগ্রহ করে। তাই রিটার্ন লীগ ব্যবস্থায় দুই দলের দুটি খেলা ছাড়াও চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয়ের জন্য আর একটি খেলা হয়েছিল। সে খেলায় ইস্টবেঙ্গলকে ২—০ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান হয়েছিল লীগ চ্যাম্পিয়ন। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের আমরা যারা জাকর্তায় গিয়েছিলুম তারা কেউ ওই ম্যাচ খেলতে পারিনি।

জাকর্তা থেকে ফিরে আসতে আসতেই আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। তৃতীয় রাউণ্ডের প্রথম ম্যাচেই আমরা ১০—০ গোলে হারালুম ভবানীপুর ক্লাবকে। মোহন-

বাগান বাষট্টিতে দারুণ টীম ছিল। ভবানীপুর যে খুব দুর্বল দল ছিল, তা কিন্তু নয়। তবু আমাদের দলের মধ্যে এত চমৎকার যোগাযোগ ও সমন্বয় গড়ে উঠেছিল যে, ভবানীপুর শীল্ডের খেলায় রেকর্ড গোলে হেরে গেল। মঙ্গল পুরকায়স্থ ও দিপু দাস করেছিল তিনটি করে গোল। আমি করেছিলুম দুটি, শেখ আলি ও অমল চক্রবর্তী একটি করে। বাটা স্পোর্টস ক্লাবকে ২—১ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান সেমিফাইনালে উঠল। সেমি-ফাইনালে ২—০ গোলে বি এন আরকে হারিয়ে উঠল ফাইনালে। অপর দিক থেকে শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে সেমিফাইনালে ১—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠল হায়দরাবাদ স্পোর্টিং।

এই সেই হায়দরাবাদ দল, যারা রোভার্স ও ডুরান্ড খেলত হায়দরাবাদ পুলিস নামে, আই এফ এ শীল্ডে হায়দরাবাদ একাদশ বা হায়দরা-বাদ স্পোর্টিং নামে। খেলোয়াড় কিন্তু একই থাকত।

পাঁচের দশক থেকে ছয়ের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলে হায়দরাবাদের অনেক কীর্তি। সেলিম, আজিজ, লতিফ, নুর, মইন, মুশেরাজ এবং পরে ইউসুফ খাঁ, নাইম আফজল, জাফর, সালে (জুনিয়র), মহম্মদ ইউসুফ, কালিম প্রভৃতিকে নিয়ে দশ-বারো বছর ধরে হায়দরাবাদ ছিল দুর্ধর্ষ টীম। তখন পর্যন্ত সাতবার রোভার্স কাপ জয়ের মধ্যে পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর জিতেছে, ডুরান্ড কাপও জিতেছে চারবার। কিন্তু আজ পর্যন্ত একবারও আই এফ এ শীল্ড জিততে পারেনি। হায়দরাবাদের খেলোয়াড়রা শুকনো এবং শক্ত মাঠেই চমৎকার খেলত। নরম ও ভিজে মাঠে তাদের খেলা তেমন খুলত না। চুয়ান্নর আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে আমাদের মোহনবাগানের কাছেই হেরে গিয়েছিল ১—০ গোলে। কিন্তু একাধিক কারণে বাষট্টির শীল্ড ফাইনালে ওরা ফেভারিট হয়ে উঠেছিল। প্রথম কারণ, শক্তি-শালী ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে খুবই ভাল খেলেছিল। দ্বিতীয় কারণ, ষাটের ডুরান্ড ফাইনালে আমাদের মোহনবাগানকেই হারিয়েছিল ১—০ গোলে। তৃতীয় কারণ, জ্বর এবং ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভীষণ কাহিল হয়ে পড়ায় ফাইনালে আমার খেলার সম্ভাবনা ছিল না।

স্টকিস্ট : মেসার্স সুখলাল মানক লাল পুরান চীনা বাজার কলিকাতা-৭০০০০১ OD/M/79-3

উনিশে সেপ্টেম্বর তারিখে মোহনবাগান সেমিফাইনাল খেলেছিল বি এন রেল দলের সঙ্গে। ওই ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্যই সে-ম্যাচে আমি খেলতে পারিনি। ফাইনাল খেলাটির তারিখ পড়েছিল বাইশে সেপ্টেম্বর। বিছানায় শুয়ে আমি ভাবছিলুম—এ কী হল! আমিই মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন অথচ লীগের মোক্ষম ম্যাচটিতে খেলতে পারিনি। কলকাতায় থেকেও ক্লাবের ফাইনাল ম্যাচেও খেলতে পারব না? এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম যে, মনে হচ্ছিল মাঠে দাঁড়িয়ে থাকাই আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এই সব কথা যখন ভাবছি তখনই দেখি ছোট বড় নানা সাইজের কয়েকটি ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ও একগাদা ওষুধ নিয়ে ডাঃ হরিহর রায় আমাদের বাড়িতে উপস্থিত। মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষ তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ডাঃ হরিহর রায়কে আমরা ডাক্তারদা বলে ডাকতুম। তিনি ছিলেন মোহনবাগানগত প্রাণ। ডাক্তারিতে হাওড়ায় খুব ভাল পসার ছিল। শুনেছি মোহনবাগানের খেলার দিন বিকেলে কোনো কল এলে মিনতি করে বলতেন, "মাঠ থেকে ফিরে এসে রোগী দেখতে যাব। দরকার হলে দুবার যাব। তার জন্য আলাদা ভিজিট দিতে হবে না। কিন্তু এখন কিছুতেই যেতে পারব না।" ডাঃ হরিহর রায় পরে মোহনবাগান ক্লাবের হকি সেক্রেটারি হয়েছিলেন। আজ তিনি বেঁচে নেই। অকালেই মাঠের মায়া এবং সংসারের মায়া কাটিয়ে পরপারে চলে গেছেন। আমাদের খেলোয়াড়দের জন্য তাঁর সে কী দরদ ছিল, আজ মনে পড়লে বিয়োগ-ব্যথাটা বড় হয়ে ওঠে।

ডাঃ হরিহর রায় সেদিন আমাদের বাড়িতে পৌঁছেই বললেন, "কিছু ভেবো না, আমি দুদিনের মধ্যেই তোমাকে খাড়া করে তুলছি।" আমি বললুম, "আমি যে শরীরে একেবারেই বল পাচ্ছি না ডাক্তারদা। খেলব কীভাবে?" তিনি বললেন, "আরে তুমি যদি শুধু মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকো, তাহলেও হায়দরাবাদের দুই-তিনজন তোমাকে গার্ড করার জন্য ব্যস্ত থাকবে। সেটাও কি কম লাভ? তাছাড়া তুমি ঠিকই খেলতে পারবে। এত সব ওষুধ ইনজেকশন কি এনেছি তোমাকে দেখানোর জন্য? নাও, হাত বের করো।"

বুক-টুক পরীক্ষা করে তখনই একটা ইনজেকশন দিলেন। খাবার একটা চার্ট এবং

মঙ্গল পুরকায়স্থ

ওষুধের একটা প্রেসক্রিপশনও করে দিলেন। ওষুধ সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন। কখন কোনটা খেতে হবে, কখন খেতে হবে হরলিকস, কখন চিকেন স্যুপ সব বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি একটু ঘুরে আসছি, তুমি একদম বিছানা থেকে উঠবে না।" ঘণ্টা দুই পরে দেখি ডাক্তারদা আবার হাজির। আবার একটা ইনজেকশন। দু-দিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন। তাঁর উপস্থিতির জন্যই হোক কিংবা ওষুধের গুণেই হোক আমি যেন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলুম।

যে-কোনো খেলাই হোক, আগের দিন বিকেলে একটু প্র্যাকটিস করা ছিল আমার চিরদিনের অভ্যাস। একুশে সেপ্টেম্বর আমি মাঠে নেমে একটু প্র্যাকটিস করার অনুমতি চাইতেই ডাক্তারদা বললেন, "দরকার নেই। আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। তাছাড়া বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। ভিজে মাঠে প্র্যাকটিস ইনফ্লুয়েঞ্জা-রোগীর পক্ষে উচিত হবে না।"

আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললুম, "ডাক্তারদা, একটু প্র্যাকটিস না করলে আমি যে আত্মবিশ্বাস পাচ্ছি না।"

অগত্যা নিজের গাড়ি করেই ডাক্তারদা আমাকে মাঠে নিয়ে এলেন। তাঁবুতে এসে দেখি ফাইনাল খেলার টিকিটের জন্য তখন হাহাকার চলছে। আমাকেই কয়েকজন ঘিরে ধরল। ডাক্তারদা তাদের ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলেন। ড্রেস করে মাঠে নেমে বল নিয়ে ছোট ছোট দুই একটি দৌড় এবং দুই একটি শট করার পর মনে হল ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। মাঠ থেকে বেরিয়ে আসছি; দেখি, ডাক্তারদা আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর এক হাতে চীনামাটির একটি পাত্র, আর এক হাতে একটি বড় সিরিঞ্জ। চীনামাটির পাত্রে

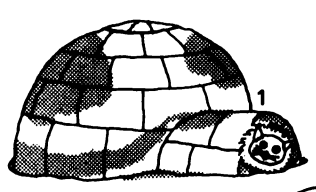

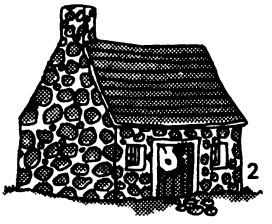

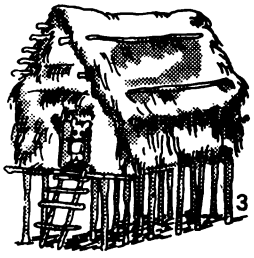

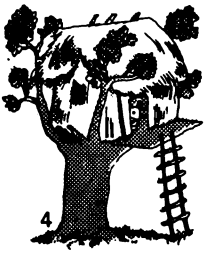

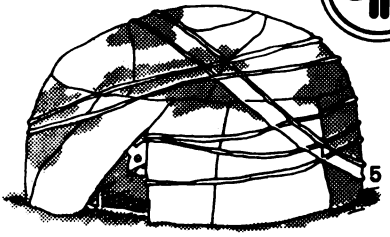

বব-এর সঙ্গে দুনিয়া সফর
ঘর দেখ! দেশ চেনো!
1
2
আনন্দময় শৈশব—রাষ্ট্রের গৌরব
Happy Child-Nation's Pride
বিশ্ব শিশু বর্ষ - ১৯৭৯
International Year of the Child.
3
4
5
6
ULKA-MS-CM-1/3 BEN
মাইনর্স সেভিংস্-এ খাতা খুলুন
সঞ্চয়ের অভ্যেস, খুব ভাল অভ্যেস
BANK OF BARODA
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
(ভারত সরকারের অধীনস্থ সংস্থা)
উত্তর : ১। উত্তর আমেরিকার এস্কিমোদের বরফের তৈরী ঘর। ঢোকার রাস্তা এভাবে তৈরী করলে ভেতরে ভালুক ঢুকতে পারে না!
২। ইউরোপের লোকেদের পাথরের ঘর! ঠাণ্ডার দেশ ব'লে এরকম ঘর-- স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় খারাপ হয় না! ৩। চীন—ভিয়েতনাম—বর্মার লোকেদের ঘর।কাঠের থামের ওপর ঘাসের ঘর! নদীর ধারে কুমীরের হাত থেকে বাঁচা যায়! ৪। আফ্রিকার লোকেদের গাছের ওপর তৈরী ঘর! বাঘের হাত থেকে সুরক্ষার উপায়! ৫। আরবের লোকেদের উটের চামড়ার ঘর! বালির ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার উপায়! ৬। পশ্চিম আফ্রিকার লোকেদের মাটি আর ঘাসের তৈরী ঘর! অত্যাধিক গরমে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে!

ছিল চিকেন স্যুপ। সিরিঞ্জে ভরা ছিল ইনজেকশন। গরম স্যুপটা এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে আমি বললুম, "ডাক্তারদা, আমি ফিট হয়ে গেছি, ইনজেকশনের আর দরকার নেই।" অত বড় সিরিঞ্জ দেখে কার না ভয় হয় বলো? কিন্তু কে শোনে কার কথা।

ফাইনালে হায়দরাবাদ দলকে ৩—১ গোলে হারিয়ে আমরা শীল্ড জিতলুম। যে দুবার হায়দরাবাদ ফাইনালে উঠেছিল সে দুবারই হারল আমাদের কাছে। আমাদের টানা তিন বছর জয়ের সম্মান। লীগ চ্যাম্পিয়ন খেতাবের সঙ্গে শীল্ড জয়ের কৃতিত্ব। মাঠে তখন আনন্দের বন্যা। সত্যিই আমরা দারুণ খেলেছিলুম। হায়দরাবাদ যে গোলটি পেয়েছিল সেটি আমাদের ব্যাক রহমানের একটু ভুলের ফল। আত্মঘাতী গোল। অসম্ভব ভাল খেলেছিল আমাদের সেন্টার ফরোয়ার্ড মঙ্গল পুরকায়স্থ। সে-ই করেছিল দুটি গোল। একটি গোল করেছিল অরুময়।

মঙ্গলের কথায় বলব, ওই বছর ও ছিল পিক ফর্মে। যেমন ছিল গতিবেগ, তেমন ছিল শটের জোর। ভবানীপুর ক্লাবের বিরুদ্ধে তার তিনটি গোলের কথা আগেই বলেছি। আর আগে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দুটি গোলই করেছিল মঙ্গল। শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে বাটার বিরুদ্ধে এবং সেমিফাইনালে বি এন আরের বিরুদ্ধেও একটি করে গোল করেছিল। ফাইনালের দুটি গোলও ছিল দেখার মতো। ফাইনালে আমি গোল না পেলেও এইটুকু বলব, নিজের খেলায় নিজে খুশি হয়েছিলুম, দর্শক-সমর্থকদেরও আনন্দ দিতে পেরেছিলুম। কিন্তু অসুস্থ শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে। খেলেছিলুম ঝোঁকের মাথায়, একটা প্রেরণা নিয়ে। খেলার শেষ দিকটায় আর পেরে উঠছিলুম না। বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলুম। তখন খেলোয়াড় বদলের নিয়ম ছিল না। রহমান ও জারনেল সিং আমার কাছে দৌড়ে এসে বলল, "কিছুতেই মাঠ থেকে বের হবে না। শুধু দাঁড়িয়ে থাকো। জয় তো হাতের মুঠোয় এসেই গেছে। আমাদের মনোবল অটুট রাখার জন্য তোমার মাঠে থাকা দরকার।" তখন আমাদের টীম স্পিরিট ছিল সত্যিই চমৎকার।

খেলার শেষ বাঁশি বেজে গেছে। বিপুল আনন্দরোলের মধ্যে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসছি। টাচ লাইনের পাশেই সোফায় বসে ছিলেন অতুল্যদা। তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলুম না। অতুল্যদাই তাঁর কাঁধের উপর আমার হাত তুলে নিলেন। অর্থাৎ অতুল্যদাকে ভর করেই তাঁর কাঁধে হাত রেখে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। সেই অবস্থায় ফোটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ বাল্‌ব্‌ জ্বলতে লাগল ঘন ঘন। অনেকে অনেক ছবি তুললেন। অতুল্যদার কাঁধে হাত রেখেছি বলে দুই-একটি কটু মন্তব্যও কানে এল। আমি কিন্তু সত্যিই দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলুম। আর প্রশ্রয় তো অতুল্যদাই দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে পুত্রের মতোই স্নেহ করতেন। তাছাড়া ওই গৌরবলগ্নের আনন্দমেলায় তাঁর বয়সটাও হয়তো হঠাৎ বিশ-কুড়ি বছর কমে গিয়েছিল।

কোনোভাবে বাড়িতে পৌঁছে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলুম। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আবার বাড়ির রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হল, যখন মোহনবাগান-সমর্থকরা শীল্ডসহ শোভাযাত্রা করে আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছল।

(ক্রমশ)

বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ জি এইচ হার্ডি ছেলেবেলা থেকেই খুব আত্মসচেতন ছিলেন। বাপ-মা যেমন ভাবতেন তাঁদের ছেলে অস্বাভাবিক রকমের তুখোড়, হার্ডির নিজেরও ধারণা ছিল তাই। ক্লাসে সব বিষয়েই তিনি প্রথম হতেন। কিন্তু মুশকিল হত যখন পুরস্কার নেবার জন্যে তাঁকে বার বার মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াতে হত। লজ্জা, ভয়, অস্বস্তি—সব মিলে একটা নিদারুণ দুর্ভোগের মধ্যে পড়তেন তিনি। এই অবস্থার হাত থেকে নিস্তার পেতে হার্ডি পরীক্ষার খাতায় ইচ্ছে করে ভুল উত্তর লিখতেন, কিন্তু ভুল লিখবার ক্ষমতা তাঁর এতই কম ছিল যে, পরীক্ষায় প্রথম হওয়া কিছুতেই আটকানো যেত না।

ইয়াং সিকিয়াং

দিদিমণি

চীনের সবচেয়ে দীর্ঘ নদীর নাম তোমরা হয়তো অনেকেই জানো—ইয়াং সিকিয়াং। ইয়াং সিকিয়াং অবশ্য গোটা এশিয়ারই দীর্ঘতম নদী এবং পৃথিবীর মধ্যে দৈর্ঘ্যে এর স্থান চতুর্থ। এই নদী ৩,৪৩৪ মাইল বা ৫,৫২৫ কিলোমিটার ধরে বয়ে যাচ্ছে। এর অববাহিকা পূর্ব-পশ্চিমে ২,০০০ মাইল দীর্ঘ এবং ৬০০ মাইলেরও বেশি চওড়া।

ইয়াং সিকিয়াং নদীর প্রধান উৎস দুটি। একটি হল টাং-কু-লা-শান-মো। এটি সমুদ্র সমতল থেকে ১৮,০০০ ফুট উঁচু একটি পাহাড়। দক্ষিণ দিকে এর দ্বিতীয় প্রধান উৎসটির নাম উলান মুরেন। এই দুটি ধারা মিলিত হওয়ার পরে নদী অগভীর চওড়া খাত সৃষ্টি করে বয়ে যাচ্ছে। মধ্যে অনেকগুলি হ্রদও আছে। নদীর এই অংশটি আছে তিব্বতের উচ্চভূমিতে। উচ্চভূমির পূর্বদিকে পেঁৗছে এই নদীর প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এখানে নদীর খাত সরু এবং গভীর—দু পাশের উচ্চভূমি খাড়া হয়ে উঠেছে। ইয়াং সিকিয়াং কয়েকশো মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে যাওয়ার পর জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে দক্ষিণ দিকে বেঁকে গেছে। অনেক সময় নদীর দু পাশের পাহাড় এত খাড়াভাবে উঠে গেছে এবং নদীখাত এত সরু যে, সেখানে কোনো রাস্তা তৈরি করবার উপায় নেই। এর পরে পূর্ব দিকে বেঁকে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে ই-পিন শহরে এসে পেঁৗছেছে। অনেক উপনদী এসে মেশায় নদীর গতিপথ চওড়া হয়ে গেছে।

মধ্যভাগের বিস্তৃতি ই-পিন থেকে ই-চান্ পর্যন্ত প্রায় ৬৩০ মাইল। এখানে ইয়াং সিকিয়াং নদী পার্বত্য জেচুয়ান প্রদেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এখানে নদীর গতি তীব্র এবং দুই তীর খাড়াভাবে উঠে গেছে। জেচুয়ান প্রদেশ ছেড়ে এসে ইয়াং সিকিয়াং পার্বত্য এলাকার তিনটি গভীর খাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। এই এলাকায় নদী একেবারেই নৌকা চলাচলের উপযুক্ত নয় এবং অনেক

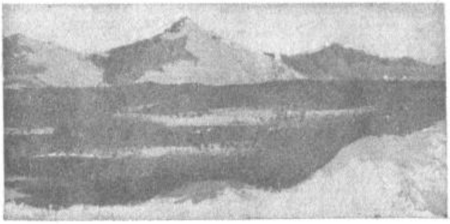

জায়গায় জলপ্রপাতও আছে। এখানে কোথাও কোথাও নদী ৫০০ থেকে ৬০০ ফুট গভীর—এবং এই জন্যে ইয়াং সিকিয়াং নদীকে পৃথিবীর গভীরতম নদীও বলা যেতে পারে।

নীচের দিকে নদী পূর্ব-চীনের সমভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। চীনের এই অংশেই সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে। এখানে নদীর গতিপথে অনেক জলাশয় আছে। এ সব জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এখানে নদী একটি বিশাল বাঁকের সৃষ্টি করেছে। নদীর এই অংশে অনেক বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে। এর পরে নদী উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ইয়াং সিকিয়াং নদীর গ্র্যান্ড ক্যানাল পৃথিবীর দীর্ঘতম খালের মধ্যে একটি। চেন-চিয়াং শহরের পর থেকে ইয়াং সিকিয়াং নদীর বদ্বীপ শুরু হচ্ছে। এখানে অনেক হ্রদ, শাখা-নদী, উপনদী, পুরনো নদীখাত, জলাভূমি ইত্যাদি দেখা যায়। ইয়াং সিকিয়াং নদী দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পূর্ব চীন সাগরে গিয়ে পড়েছে।

ইয়াং সিকিয়াংয়ের অববাহিকা হল চীনের শস্য-ভাণ্ডার। চীনের প্রায় অর্ধেক ফসল এখানেই উৎপন্ন হয়। শতকরা ৭০ ভাগ ধান এখানেই জন্মায়। এ ছাড়া কার্পাস, গম, যব, ভুট্টা, বীন আর হেম্প—অর্থাৎ এক রকমের তন্তুও এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়। সাংহাই, নানকিং, উ-হান, চুংকিং চেংটু প্রভৃতি বড় বড় শহর এই নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদী উচ্চ প্রবাহে তিব্বতীয় উচ্চভূমির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে।

ইয়াং সিকিয়াং নদীর গতিপথের ১,৭০০ মাইল জুড়ে নৌ-চলাচল করে। বড়-বড় জাহাজ মোহনা থেকে ৭০০ মাইল দূরে অবস্থিত উ-হান শহর পর্যন্ত আসতে পারে। খাল কেটে ইয়াং সিকিয়াং নদীকে অন্যান্য নদীর সঙ্গেও যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইয়াং সিকিয়াং নদীতে দু জায়গায় রেল সেতু তৈরি করা হয়েছে—নানকিং ও উ-হানে।

বাঘা ১

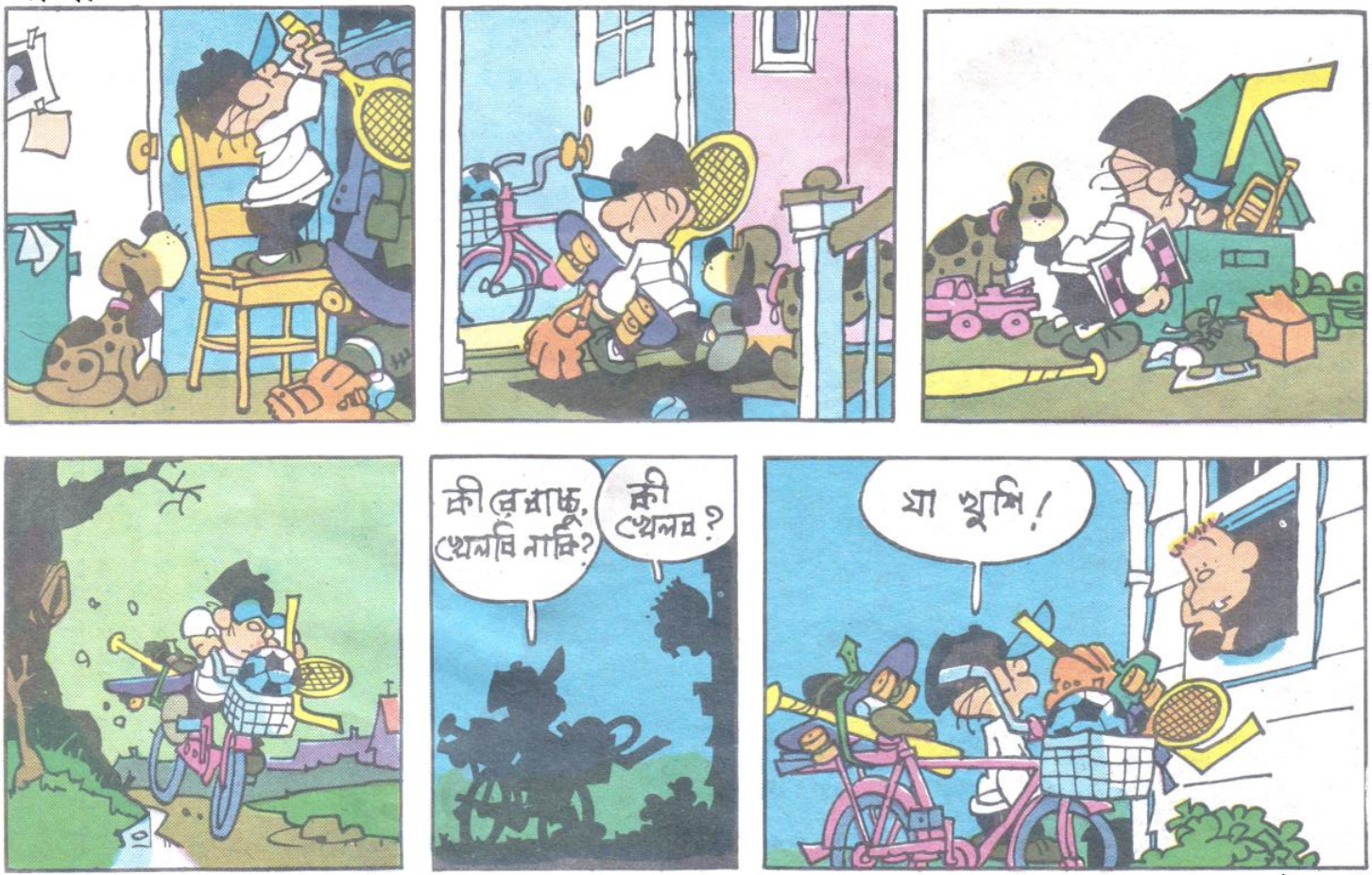

(বাঘা-২ ষাটের পাতায়)

টুপুর দুপুর

তৃপ্তি রায়

দুপুরবেলাটা টুপুর একদম ভাল লাগে না। এত বড় বাড়িতে শুধু সে আর দিদা। মা, বাবা, দিদি—কাউকে সে পায় না। কী রকম যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।

কোনও সঙ্গী নেই, একা-একা সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে কাঁহাতক আর ভাল লাগে। ঘুরে বেড়ানোরও উপায় আছে নাকি? অমনি আরম্ভ হবে দিদার বকুনি—"টুপু, এই রোদ্দুরে খালি টং-টং করে বেড়ানো, অসুখ করলে কী হবে তাই শুনি? দাঁড়াও, তোমার বাবা বাড়ি এলে তোমার গুণের কথা আমি সব বলে দেব।"

এইরকম কথাবার্তা শুনলে কার না রাগ হয়? অথচ এমনিতে দিদা খুব ভাল, রসগোল্লা সন্দেশ খাওয়ানোর ব্যাপারে বেশ মুক্তহাত। তাছাড়া বাবা, মা, দিদি—যে কারুর হাত থেকে বাঁচতে গেলে দিদাই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।

কিন্তু তা বলে সারা দুপুর ঐ বুড়ো মানুষ দিদার কাছে বসে থাকতে কি কারও ভাল লাগে? দিদা হয় কাসেন, নয় হাঁপান।

রামায়ণ-মহাভারতের গল্প দিদা খুব ভালই বলেন, কিন্তু একটানা বেশিক্ষণ না শুনলে টুপুর ভাল লাগে না।

দুপুরবেলা বাবা আর দিদি দুজনেই কলেজে—মা ইশকুলে। টুপু বলতে গেলে একদম একা।

মায়ের খুব ইচ্ছে, টুপুকে এবার ইশকুলে ভর্তি করে দেওয়া হোক। পাঁচ বছর বয়স হল, অথচ একদম পড়তে চায় না। ইশকুলে যাওয়া দরকার। শুনে বাবা বলেন, আর একটু বড় হোক। একেবারে উঁচু ক্লাসে ভর্তি করলেই হবে।

টুপুর খুব ইচ্ছে হয় ওর দিদি পুপুর সঙ্গে কলেজে যেতে। দিদি ওর চেয়ে অনেক বড়, দুটো বিনুনি ঝুলিয়ে কলেজে যায়। টুপু নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে একবার দেখে নেয়, ইশ, তার চুলগুলো কী খোঁচা-খোঁচা। কবে যে দিদির মতো লম্বা চুল হবে। দিদিকে সে ভীষণ ভালবাসে, কিন্তু দিদির সঙ্গে তার খুব ঝগড়া হয়। দোষটা টুপুরই বেশি, কিন্তু সবাই যখন পুপুকে বলে, তুই অত বড় দিদি, ঐটুকু বোনের সঙ্গে ঝগড়া করতে তোর লজ্জা হয় না। দিদি কিন্তু বকুনি খেলে খুব কষ্ট হয় টুপুর।

সকাল, সন্ধে, বিকেল—সবাই যখন বাড়ি থাকে তখন কিন্তু খুব ভাল লাগে টুপুর, খালি দুপুরটা একদম ফাঁকা।

খাওয়া-দাওয়ার পরে দিদা টুপুকে পাশে নিয়ে শোন। টুপুকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে করতে শেষকালে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েন। অমনি টুপু চুপি-চুপি ঘর থেকে বার হয়ে নারকেল গাছটার তলায় বাঁধানো বেদীর ওপর চুপ করে বসে থাকে। তখন কিন্তু ভারী মজা লাগে।

চারদিকে কত কাঠবেড়ালি ঘুরে বেড়ায়, লেজ উঁচু করে ছোটে। কী সুন্দর লাগে। আর কত রকমের যে পাখি আসে! পাখি তার এত ভাল লাগে। আহা! সেও যদি ঐ রকম পাখি-দের মতো আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে পারত। দিদা, বাবা, মা, দিদি—কেউই তাহলে আর তার নাগাল পেত না।

সবরকম পাখির নাম না জানলেও অনেক পাখির নামই জেনে ফেলেছে টুপু। ঐ যে এক-জোড়া কী সুন্দর পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা হচ্ছে ঘুঘু পাখি। ঐ ঝুঁটি-বাঁধা কালো রঙের পাখিগুলো বুলবুলি। দোয়েল পাখি কী সুন্দর শিস দেয়। ছুঁচলো-ঠোঁট ছোট্ট পাখি-গুলোর নাম দুর্গা-টুনটুনি। হলুদ কালোয় মেশানো চমৎকার পাখিগুলোর কী যেন নাম।

ইঁদারার পাড়ে জল জমে থাকে, দুপুর-বেলা পাখিগুলো সেই জল খায়, অনেক পাখি আবার ঐ জলে স্নানও করে। পাখি আবার স্নান করে। কী মজা!

ফাল্গুন মাস, শীত চলে যায়নি এখনও। দুপুরে কী রকম একটা হাওয়া দেয়, ইঁদারার ধারের আমগাছটা থেকে মুকুল ঝরে ঝরে মাটির ওপর পড়ে, বাতাবি লেবু গাছের ফুলে কী সুন্দর গন্ধ। নিমগাছের ওপর বসে একটা কোকিল ডাকে—কু-উ, ডাক শুনে টুপুর খুব মায়ের জন্য মন কেমন করে। দুপুরে মা বাড়ি থাকলে এত ভাল লাগে।

মায়ের চাকরি করার কী দরকার? রোজই সে মাকে বারণ করে, "মা, আজ আর ইশকুলে যেও না।" মা তার কথা শুনে শুধু হাসেন। মায়ের ওপর এমন রাগ হয় তখন।

ওমা! একটা বেড়াল এসে কাঠবেড়ালিটার

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঠবেড়ালিটা করুণভাবে কিচ্ কিচ্ করে ডেকে উঠল, তারপরেই চুপ।

টুপু একটা ইঁট হাতে করে দৌড়ল বেড়ালটার দিকে। কিন্তু দুষ্টু বেড়ালটা তার আগেই কাঠবেড়ালিকে মুখে করে নিয়ে দে ছুট। ঐ জায়গাটায় খালি খানিকটা রক্ত আর কাঠবেড়ালির লোম ছড়িয়ে পড়ে আছে।

টুপু চুপ করে গিয়ে বেদীটার ওপর বসে রইল। পুষিটা যে এত পাজি তা তো জানা ছিল না। আর ঐ পুষিকেই সে কিনা মা আর দিদাকে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের মাছ আর দুধ খাওয়ায়। এই তার প্রতিদান! টুপু ঠিক করল আর কখনও সে পুষিকে কিছু খেতে দেবে না।

আচ্ছা, ঐ হাঁড়িচাচা পাখিটা এরকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? হাঁড়িচাচা পাখিগুলো কী রকম বড় হয়, আর গলার আওয়াজও কী বিচ্ছিরি!

পাখিটার মতলব কী? ওমা! জুঁইগাছের ঝোপের মধ্যে বুলবুলিতে বাসা তৈরি করেছিল, হাঁড়িচাচা তার সন্ধান পেয়ে গেছে। টুপু আবার ইঁট নিয়ে ছুটল জুঁইগাছের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। শয়তান পাখিটা ডিমগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। টুপু গিয়ে দেখল দুটো ডিম ভাঙা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে, বাকি ডিমটা ঠোঁটে করে নিয়ে পাখিটা উড়ে পালাল।

মা-আর বাবা-বুলবুলিটা কীরকম করুণ সুরে ডাকছে আর বাসাটার চারদিকে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

টুপুর বুকের কাছে কেমন যেন যন্ত্রণা হচ্ছে, গলার কাছে কান্নাটা যেন দলা পাকিয়ে আসছে। এ যন্ত্রণার অনুভূতি তার কাছে একেবারে নতুন। বাবার বকুনি, দিদির কানমলা বা মায়ের কাছে চড়-চাপড় খেয়ে যে কষ্ট হয়, এ কিন্তু সেরকম কষ্ট নয়।

টুপুর দুচোখ গড়িয়ে জল পড়তে লাগল।

গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের একজন নাগরিক এসে দার্শনিক সক্রেটিসকে খবর দিল, ঈশ্বর-বিরোধী চিন্তাধারা প্রচারের জন্যে এথেন্সবাসীরা তাঁর প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়েছে। সক্রেটিস মুচকি হেসে সেই সংবাদ-বাহককে বললেন, "তোমাকেও একটা খবর দিই,—প্রকৃতির বিধানে এথেন্সবাসীরাও চিরকাল বেঁচে থাকবে না।"

শত্রুর বিনাশ

শত্রুদন্ত-ভক্ষক (COOH*) দন্ত-প্রদেশ বিনাশের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী সেনা দলকে প্রশিক্ষিত করছে।

CANDY
SUGAR

সেনাপতির কাছে সমাচার পৌঁছলো।

বিনাকা-এফ'কে এখুনি আমাদের ডেকে পাঠানো উচিত। আমাদের যে যুদ্ধের হাতিয়ারের অভাব, দন্ত-ভক্ষক তা জানে।

বিনাকা-এফ যুদ্ধের এই আহ্বানকে স্বীকার ক'রে নিল।

বিনাকা ফ্লোরাইড টুথপেস্ট ও বিনাকা টুথব্রাশের সাহায্যে আমরা নীচ দন্ত-ভক্ষককে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেব।

BF

দন্ত-প্রদেশের নিয়মিত সেনারা দিনরাত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

সময়—সোমবার, ডিসেম্বর ৮, কথগ ৯— রাতের অন্ধকারে, দন্ত-ভক্ষক করল আক্রমণ।

কিন্তু বিনাকা-এফ ও দন্ত-প্রদেশের সৈন্যেরা মিলে মোক্ষমভাবে তাদের প্রতিরোধ করল।

পালাও সবাই! নয়তো মারা পড়ব!

এইভাবে বিনাকা-এফ ও দন্ত-প্রদেশের সৈন্যেরা মিলে দন্ত-ভক্ষকের সৈন্যদের বিনাশ করল।

Binaca Fluo

দন্ত-প্রদেশের সেনাদের এ এক মহান বিজয়!

এর সমস্ত কৃতিত্ব হচ্ছে উৎকৃষ্ট হাতিয়ার ও প্রশিক্ষণের তার মানে বিনাকা ফ্লোরাইড ও বিনাকা টুথব্রাশের।

* দাঁতের এনামেল নষ্ট ক'রে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত সৃষ্টিকারী কার্বোক্সিল অ্যাসিড গ্রুপের ফর্মুলা।

বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্ত-ক্ষয় বন্ধ করার জন্যে—বিনাকা ফ্লোরাইড

(গাবলু-২ একষট্টির পাতায়)

ডুবো পাহাড়ের গল্প

কুম্ভক

কিন্তু একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে না ভাল।

কী জিনিস?

যদি বলি, চরদি শুয়ে আছে উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার মতো, তাহলে তো বোঝা গেল একটা 'মতো' আছে ওখানে। কিন্তু 'দুগ্ধফেননিভ' শয্যা'র মধ্যে মতো কোথায়? কিংবা ধরো, চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি, কিংবা চাঁদ হল কাস্তে—এ-সবের মধ্যেই বা মতো কোথায়? এই কদিনে তুমি এ-রকম অনেক বলেছ, যার মধ্যে সত্যি-সত্যি কোনো মতো-কথা নেই।

নেই? তবে তো ডুবোপাহাড়ের ব্যাপারটা বলতে হয়।

ডুবোপাহাড়?

হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে বলি, দুগ্ধফেননিভ-তেও মতো নেই?

কোথায় আছে?

কোথাও নেই? নিভ-টা তাহলে কী? নিভ তুল্য সদৃশ অসদ্রূপ—এ-সবই যে মতোর রকমফের তা বুঝি জানিস না?

ও। আর ডুবোপাহাড়ের কথাটা কী?

অনেক সময়ে পাহাড় যে জলের তলায় ডুবে থাকে, জানিস তো? সেটা যদি জানা না থাকে চলতে চলতে অনেক জাহাজ ধাক্কা খায় তাহলে, চুরমার হয়ে যায়।

তাতে কী হল?

কী আর হবে। বলছি যে, মতোটাও সেইরকম। কখনো কখনো মাথা উঁচু করে জানান দেয় সবাইকে, কখনো-বা ডুব দিয়ে থাকে জলের তলায়। 'চাঁদ যেন রুটি', এ তো তবু ভাল কথা। মতো-র কাছাকাছি একটা শব্দ তবু তো আছে ওখানে

কোন্‌টা?

ওই যে, যেন। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে ওটাও রইল না। ধর, চাঁদকে দেখে বলল কেউ, 'আহা, রুটি!' এখানে তো মতো নয় কেবল, চাঁদটাও দিয়েছে ডুব।

এগুলিকেও তুমি মতো-কথা বলবে?

মতো-কথা শব্দটা তো আর আমি বলিনি। ও তো নন্তুর আবিষ্কার। সেটা মেনে নিলে, হ্যাঁ, এগুলিকেও বলব মতো-কথা। কেবল মনে রাখতে হবে যে, এর নানা রকমের চেহারা আছে, নানা রকমের ডুব। শুনবি?

শুনব।

ধর, কেউ বলতে চায় যে তোর মুখটা চাঁদের মতো—

নন্তু বলল : উদাহরণটা একটু পালটে 'প্যাঁচার মতো' করে নিলে হয় না?

থাম তুই। এখন, এই কথাটাকে কতভাবে বলা যায় দেখ। চাঁদের মতো মুখ। চাঁদমুখ। মুখটা যেন চাঁদ। মুখ না কি চাঁদ? মুখ নয়, চাঁদ। চাঁদ নয়, মুখ।

নন্তু আবার বলল : এই শেষ কথাটা সাত্য কথা।

দাদা, খুব গোলমাল করছ। একটু চুপ করে শোনো তো! তারপর কাকু।

তারপর বললে তো নন্তু খুবই রাগ করবে। এও বলা যায়, তোর মুখের কাছে কোন্ ছার ওই চাঁদ!

রাগ কেন করব? আমিও কি জানি না ভাবছ!

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে তার পড়ে আছে কতগুলা॥

ঠিক। এখন, এই সবই কি মতো-র রকমফের নয়? কথাগুলিকে একটু ভেঙে দেখলেই বোঝা যায় যে এর মধ্যে ডুবোপাহাড়ের মতো লুকোনো আছে ওই মতো-কথাই, ওই উপমা।

উপমা?

হ্যাঁ। নন্তুর মতো-কথা খারিজ হল এখন থেকে। এখন থেকে আমরা বলব উপমা।

এই সবই তাহলে উপমা?

না, সবই উপমা নয়। কিন্তু এই সবের মধ্যেই লুকোনো আছে উপমা।

একটার থেকে অন্যটা কীভাবে আলাদা হচ্ছে?

হ্যাঁ, সেই ডুবগুলোই আমাদের বুঝতে হবে পরে।

(ক্রমশ)

কে জানে কোথায় আরাবল্লী

প্রসাদ

বেচারি মিলি! আরাবল্লীকে সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সবাই জানে, কিন্তু মিলির যে তার জন্যে কী মন খারাপ আর কী দুশ্চিন্তা, সে-খবর কে রাখে বলো? কারো যেন কোনো মাথাব্যথাই নেই। আমরা নেহাত তার ডায়েরিটা দেখে ফেলেছি তাই জানি:

Chameli is very unhappy.

She is very unhappy because Araballi is missing.

Chameli is very fond of Araballi.

তা ছাড়া, চামেলির এত বেশি দুর্ভাবনা কেন হচ্ছে জানো? আগেও যে একবার তাকে এ-রকম শোক পেতে হয়েছিল:

Chameli once had another cat.

The name of that cat was Agnimitra.

Agnimitra also left the house and did not come back.

কাজেই, আমরা চামেলির মনের অবস্থা বুঝতেই পারছি।

Agnimitra has not come back since that day.

Araballi has not come back since this morning.

Chameli has searched in the house.

She has searched in the garden.

She has asked the neighbours.

She has asked everybody.

She has looked under every bed.

She has looked behind every bush.

চামেলির দুশ্চিন্তা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, কতরকম কথা মনে হচ্ছে:

What has happened to the poor dear?

Has some wicked dog killed her?

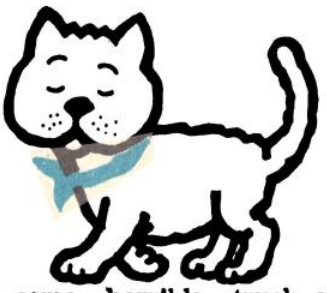

Has some horrible truck crushed her under its wheels?

আবার মনে হচ্ছে, না না, সে-সব কিছু নয়:

I think she has lost her way.

সঙ্গে সঙ্গে আরও কত ছবি চামেলির চোখের ওপর ভেসে উঠল:

Poor Ara!

She's hungry and tired.

She's afraid because she's so far from home.

She doesn't know her way back.

এর পর এসো তোমাতে আর আমাতে এইসব ব্যাপার নিয়ে খানিক কথাবার্তা হোক। আমি জিজ্ঞেস করি তুমি উত্তর দাও। প্রথম দুটো উত্তর তোমার হয়ে আমিই লিখে দিলাম, বাকিগুলো তুমি লেখো:

Q. How long has Araballi been missing?

Ans. Araballi has been missing since the morning.

Q. What has Chameli been doing?

Ans. Chameli has been searching for her.

Q. Where has she been searching?

Ans. .. ..

Q. Has Chameli found her yet?

Ans. .. ..

Q. Whom has she asked about Araballi?

Ans. .. ..

Q. What do you think has happened to Araballi?

Ans. I think Araballi ....

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

বাংলার দু' নম্বর গোলকীপার

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

কে না জানে কলকাতার একটি বড় ক্লাব এবার যে গোলকীপারটিকে পেতে চেয়েছিল তিনি হচ্ছেন মহামেডান স্পোর্টিংয়ের নাসির আমেদ। শেষ পর্যন্ত তা আর হয়নি। গত বছরের মতো এ বছরও নাসির মহামেডানেই খেলছেন।

নাসিররা আগে থাকতেন হাবড়ায়। ১৯৬৪ সালে হাবড়ার পাট একরকম চুকিয়ে দিয়ে ওঁদের বাড়ির সবাই চলে যান বাদুড়িয়া। নাসিরের বাবা গনিসাহেবের নিজেরই

একটা ফুটবল টীম ছিল—ছাত্র সংহতি। তাছাড়া নাসিরের দাদা নৌসাদ আমেদও জেলা একাদশে স্থান পেতেন। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও ফুটবলার ছিল দু'চারজন। বলা যেতে পারে, নাসির ফুটবলের পরিবেশেই বেড়ে উঠেছেন।

নাসিরের মধ্যে সম্ভাবনা আছে এটা প্রথমে বুঝতে পারেন মহামেডান অ্যাথলেটিক ক্লাবের এক কোচ। দেবনারায়ণ রায়। ওঁরই চেষ্টায় এবং আগ্রহে নাসির ১৯৭৩ সালে তখনকার অ্যালেন লীগের দল প্রবাসী উৎকল ক্লাবে খেলেন। পরের বছর দ্বিতীয় ডিভিসনের কালীঘাট মিলনীতে। তখন কালীঘাট মিলনীর কোচ ছিলেন নিশীথ বিশ্বাস, যিনি এককালে মোহনবাগান, উয়াড়ি ও ইস্টবেঙ্গলে খেলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। নিশীথবাবু এবং তাঁর আগে দেবনারায়ণবাবু, এঁদের দু'জনের কাছেই নাসিরের খেলা শেখা। মিলনীতে খেলার সময় নাসির নদীয়া জেলার লীগেও খেলতেন—হীরোজ ক্লাবের হয়ে। সেই বছরই আই এফ এ শীল্ডে নদীয়া জেলা একাদশ উয়াড়ির মুখোমুখি হল। জেলা একাদশের হয়ে নাসির নিশ্চয়ই খুব ভাল খেলেছিলেন। তা না হলে উয়াড়ি থেকে ডাক আসবে কেন? সুতরাং পরের দু'বছর উয়াড়িতে কাটল নাসিরের। ১৯৭৭-এ রাজস্থান। মহামেডানে এসেছেন মাত্র গত বছর। এবং নিজগুণে বাংলার দ্বিতীয় গোলরক্ষকের আসনটি দখল করে গতবারই শ্রীনগরে সন্তোষ ট্রফি খেলতে যান।

বসিরহাট কলেজে কিংবা গোবরডাঙ্গা কলেজে যাঁরা নাসিরের সহপাঠী ছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই নাসিরের জন্য গর্ব অনুভব করেন। যেমনটি এখন করেন কলকাতা রাজ্য পরিবহণ কর্পোরেশনের কর্মীরা তাঁদের সহকর্মীর জন্যে। পঁচিশ বছর বয়েসী এই লাজুক যুবকটির ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ নেই।

নাসিরের প্রিয় গোলরক্ষক কে? তরুণ বসু। আজকের খেলোয়াড়দের মধ্যে ভাস্কর ও আলমগীর। সাধারণভাবে প্রিয় খেলোয়াড় অবশ্যই হাবিব। 'হাবিবদা' সম্পর্কে নাসির খুব শ্রদ্ধাশীল।

নাসিরের সবচেয়ে স্মরণীয় ম্যাচ কোনটি? গতবার লীগে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। ঐ

নাসির বল কেড়েছেন, সামনে সুরেশ

খেলায় মহামেডান ০-২ গোলে হেরে গেলেও নাসিরকে দারুণভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেই নাসির তাঁর জীবনের সবচেয়ে খারাপ খেলাটি খেলেছেন। তখন তিনি ছিলেন রাজস্থানের খেলোয়াড়। তাঁর একটি ভুলের জন্য ইস্টবেঙ্গল গোল করে ফেলে। ব্যস, সারা খেলায় আর কোনও গোল হয়নি। এই ভুলটির কথা মনে পড়লে নাসির আজও লজ্জা পান। নাসিরকে সবচেয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত করেছে কোন্ ফরোয়ার্ড? আমার প্রশ্ন শুনে নাসির হেসে ফেললেন। পরে বললেন, বলতে পারা যায় আরারাত-এর ১০ নম্বর খেলোয়াড়টি।

গল্প করতে করতে নাসির আমেদ একটি মজার ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। ওঁদের অফিস টীম ১৯৭৭-এ মধ্যপ্রদেশের জগদ্দলপুরে গোল্ড ট্রফি জিতেছিল। ট্রফিটি সুদৃশ্য, বিরাট এবং সব দিক দিয়ে দামি। খোয়া গেলে পঞ্চাশ হাজার টাকা খেসারত দিতে হবে। তাই টীম ম্যানেজার দাশুদা (দাশরথি সিন্‌হা) কোনও ঝুঁকি নেননি। ট্রেনে সারাটা পথ ট্রফিটি বুকে করে শুয়েছিলেন। উঠলেন কলকাতায় এসে।

নাসিরের অবসর - সময় কাটে নানারকম খেলার বই ও পত্রপত্রিকা পড়ে। হ্যাঁ, তার মধ্যে আনন্দমেলাও আছে। পাক্ষিক আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে উনি বললেন—যে ক্লাবকেই সমর্থন করো না কেন, অপরদের গুণের আদর করতে যেন কখনো ভুল না হয়।

লীগ পেল মোহনবাগান

অশোক কাশগুপ্ত

৪ অগস্ট ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান স্পোর্টিং ম্যাচ শেষ হবার প্রায় দু'ঘন্টার পর মহামেডানের এক কর্মকর্তার গাড়িতে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে সমরেশ চৌধুরী মৃদু হেসে কোচ অমল দত্তকে যা বলেছিলেন, সেটাই এবারের কলকাতা প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগের সার কথা। ক্লান্ত আহত পিন্টু চৌধুরী সেদিন বলেছিলেন, "অমলদা, লীগটা মোহনবাগানকে দিয়ে দিলেন!"

ঐ ৪ অগস্ট সন্ধ্যায় অমল দত্ত কথাটা এইভাবে সমরেশ চৌধুরীকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন: "পিন্টু, লীগটা মোহনবাগানকে দিয়ে দিলে!"

ডেভিডের হেড গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রবীণ সমরেশ যদি মোহনবাগানের লীগ-জয় নিশ্চিত করে থাকেন, চ্যাম্পিয়নশিপের রাস্তা প্রায় চূড়ান্তভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন আর-এক প্রবীণ—শ্যাম থাপা, ২৪ জুলাই বিকেলে। ১৩ অগস্ট বিকেলে লীগের চূড়ান্ত খেলায় সেই শ্যামই এরিয়ানের নেটে দুটি গোল ঢোকালেন।

লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের ফয়সালায় আর-এক প্রবীণ মহম্মদ হাবিবের কি কোনো ভূমিকাই নেই? ৫ অগস্ট সকালে হায়দরাবাদ উড়ে যাবার আগে এলিয়ট রোডের ক্লাব-মেসে সুটকেস গোছাতে-গোছাতে হাবিব জানালেন, "আছে, আছে!"

শান্ত মিত্রর কথায় সুভাষকে প্রথম খেলিয়েছিলেন স্বয়ং হাবিব। তবু, এই বিশেষ দিনের জন্য দিনকরকে দরকার—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। কোচ অমল দত্ত প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হাবিবের পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

৪ অগস্ট বিকেলে মহামেডানের দেওয়ালে-পিঠ-দেওয়া লড়াইয়ে দিনকর অবশ্যই ছিলেন অন্যতম সহ-নায়কের ভূমিকায়।

লীগ ইস্টবেঙ্গল বা মহামেডান স্পোর্টিং পেল না। কিন্তু এখনো অনেক কিছু বাকি।

শ্যাম

১৯৭৭-এ লীগে হেরে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ত্রিমুকুট জয়ের রেকর্ড করেছিল মোহনবাগান। ১৯৭৮-এ লীগে ইস্টবেঙ্গলের হার সত্ত্বেও গৌহাটি আর দিল্লির মাঠে উড়েছিল লাল-হলুদ পতাকা।

তবু, আপাতত মোহনবাগানের সমর্থকদের গলা এবং কলার—দুটোই উঁচু। এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়, শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে দেখা হবে কিনা। তবে, "দেখা হলে গোল করব"—এমন আশা জোর গলায় প্রকাশ করেছেন দুই টীমের অন্তত তিনজন ফরোয়ার্ড।

মহামেডান স্পোর্টিংয়ের এক তরুণ ডিফেন্ডার চাপা উত্তেজনায় বললেন, "এইসব কথা শুনলেই রাগ হয়। আমরা কি মুখ দেখাতে মাঠে নামব? মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে দেখা হতেই হবে?"

মানস

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

সেই পিন্টু

ফাইটার

গত বছর ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের এক বিখ্যাত ফুটবলার গোল লাইনে দাঁড়িয়ে মহামেডানের একটি অব্যর্থ গোলের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি এবারও গোল লাইনে দাঁড়িয়ে দুটো অব্যর্থ গোল রুখে দিয়েছেন—তবে উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে, মহামেডানের হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে।

খেলার আগের দিন এই অনেক যুদ্ধের নায়ক সমরেশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল গৌতম সরকারের। গৌতম বলেছিলেন, "কী হবে কাল মাঠে গিয়ে. ইস্টবেঙ্গল অনেক ভাল টীম. সহজেই জিতে যাবে।" পিন্টু চৌধুরী স্মিতহাস্যে জবাব দিয়েছিলেন, "অত সহজ নয়। পার্টনার, কাল তুমি মাঠে এসো। দেখবে, একটা পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলকে হারাতেই হবে।" গৌতম মাঠে গিয়েছিলেন। তাঁর পার্টনার দু'বার গোল লাইন থেকে বল ফিরিয়ে দিয়ে ইস্টবেঙ্গলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছেন।

খেলার শুরুতেই স্পষ্ট হয় যে, মহামেডান কোচ অমল দত্তর লক্ষ্য একটি পয়েন্ট। পিন্টু প্রথমে হাবিবের পাশে স্ট্রাইকারের জায়গায় দাঁড়িয়ে কিক অফ করলেন। তারপর মাঝমাঠে কয়েক মিনিট দেখালেন, এখনো তাঁর পায়ে হাজার ম্যাজিক। এবং তারপর, কুড়ি মিনিট কেটে যেতেই চলে গেলেন চার স্টপারের পিছনে। চার তরুণ ডিপ ডিফেন্ডারকে নেতৃত্ব দিতে-দিতে বুঝিয়ে গেলেন, জাত-ফুটবলাররা নিভে যাওয়ার মুখেও জ্বলে উঠতে পারেন।

গোলকীপার নাসির, চার ব্যাক ফিলিপ, গৌরাঙ্গ, মইদুল ও অশোক, লিংকম্যান অমল রাজ ও খাবাজি—এঁরা তো লড়েছেনই দুর্দান্ত, তার ওপর প্রায় সবসময়েই নীচে নেমে দেওয়াল গড়েছেন দিনকর। খেলার আগের দিন হাবিব বলেছিলেন কোচ অমল দত্তকে, "আপনি যেভাবে আমাদের খেলাতে চাইছেন, তাতে ভাল ফল হবেই।

সামনে ছিলেন হাবিব। আর ছিলেন জাতিফুদ্দিন। ২১ জুলাই তাঁর শট মোহন-বাগানিদের বুক কাঁপিয়ে বার ছুঁয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। ৪ আগস্ট তাঁরই শট অমিতের সতর্ক হাত ছুঁয়ে বাইরে যায়।

মনোরঞ্জন চোট পেয়ে বাইরে যেতেই চিন্ময় স্টপারের জায়গায় চলে আসেন। পাশে ছিলেন শান্ত এবং চিরবিশ্বস্ত শ্যামল ঘোষ, যিনি জানেন না কী করে মাথা-গরম করতে হয়।

কিন্তু মাঝমাঠ এদিন ছিল মহামেডানের দখলে। তবু, দ্বিতীয়ার্ধেই শুরুতেই সব-কিছু ভেঙে-চুরে সুরজিৎ সেনগুপ্ত, খেলতে শুরু করেছিলেন সেই ফুটবল—যা তাঁকে ভারতের বিভিন্ন মাঠে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। প্রায় আঠারো গজ দূর থেকে সুরজিৎ মেরেছিলেন একটি আলতো আউটসুইঙ্গার—যা নাসির আমেদ অনায়াসে বারের ওপর ভাসিয়ে দেন। কিন্তু একের পর এক গোলের সুযোগ তো তৈরি করে দিচ্ছিলেন সুরজিৎই। কিন্তু

সমরেশ ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

মিহির-সাব্বির-ডেভিডরা সম্ভবত সেদিন গোল করার বুট টেন্টে রেখে এসেছিলেন।

নাটক ছিল খেলার একেবারে শেষ মুহূর্তে। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের একেবারে সামনে বল পেয়েও আলতো হেড করেছেন ডেভিড। কিন্তু অসাধারণ তেজী এই নাই-জিরিয়ান তরুণ ছটফট করেছেন—যদি কিছু করা যায়। শেষ মিনিটে সুরজিতের বাড়ানো বলটি ধরবার জন্য যখন ডেভিড ছুটছিলেন, এবারের হাতছাড়া লীগটাকে ধরার শেষ চেষ্টার নির্ভুল ছবি ছিল তাতে। ডেভিড বল ধরেছিলেন, সেন্টারও করেছিলেন—সেই সেন্টার শুধু নাসির নয়, মিহির এবং কাজল চ্যাটার্জিকেও ফাঁকি দিয়ে বাইরে চলে গেল। ডেভিড তখন দুঃখে মাথায় হাত দিলেন। সেই মুহূর্তের ডেভিড উইলিয়ামস ইস্টবেঙ্গল-জনতার সমস্ত হতাশার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া

অলোক দাশগুপ্ত

এবারের ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া দলে ইয়ান, গ্রেগ চ্যাপেল, লিলি টমসন, প্যাসকো, মার্শ, হুকস, লেয়ার্ড প্রমুখ খেলোয়াড়রা নেই। এঁরা দলে থাকলে আমরা এই ভেবে পুলকিত হতাম যে, পৃথিবীর সেরা কয়েকজন ক্রিকেটারের খেলা দেখতে পাব। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতের সিরিজ জয়ের কোনও সম্ভাবনাই থাকত না।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড বর্তমান সফরে প্রাক্তন প্যাকারাইটদের কথা বিবেচনা করেননি। ভারতে যে দলটি এসেছে সেটি এইরকম : কিম হিউজেস (অধিনায়ক), অ্যান্ড্রু হিলডিস (সহ-অধিনায়ক), রিক ডার্লিং, অ্যালান বর্ডার, গ্রাহাম ইয়ালপ, গ্রেমি উড, কেভিন রাইট, ব্রুস ইয়াডলি, জিমি হিগস, রডনি হগ, অ্যালান হার্স্ট, জিওফ ডায়মক, পিটার স্লিপ, ডেভ হোয়াইটমোর এবং গ্রেমি পোর্টার। এই পনেরো জনের মধ্যে একমাত্র পোর্টার ছাড়া বাকি সকলেরই টেস্ট-ক্রিকেটে হাতেখড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু এই দলটিকে বেশ অনভিজ্ঞ এবং দুর্বল বলা যেতে পারে। অবশ্য ভারতকে বেগ দেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি হিউজেসের দলের আছে। ভারতের বাড়তি সুবিধা হল এই যে, ভারত হাজার-হাজার 'দেশপ্রেমী' দর্শকের সামনে এবং ভারতীয় উইকেটে খেলবে। চোখ বুজে বলা যায় যে, এই উইকেট স্পিনারদের উপযোগী করে তৈরি করা হবে। অস্ট্রেলিয়াকে মোট ছটি টেস্ট খেলতে হবে। সমস্ত রকম সুবিধা-অসুবিধা যাচাই করে বলা যেতে পারে যে, এই সিরিজে দুই দলের জয়ের সম্ভাবনা প্রায় সমান সমান।

বর্তমান অস্ট্রেলিয়া দলটির সেরা আকর্ষণ হল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার রডনি হগ। টমসন, লিলি, প্যাসকো ওয়াকাররা প্যাকারের দলে যোগ না দিলে ২৮ বছরের হগ হয়তো টেস্ট খেলার সুযোগই পেতেন না। কিন্তু প্রথম আবির্ভাবেই হগ দারুণ খেলেছেন। মাইক ব্রিয়ারলির শক্তিশালী

কিম হিউজেস

ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে ছটি টেস্টে ৪১টি উইকেট দখল করেছেন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে পরবর্তী দুটি টেস্টে পেয়েছেন আরও দশটি উইকেট, এক ইনিংসে পাঁচ বা তারও বেশি উইকেট লাভ করেছেন পাঁচবার এবং একটি টেস্টে ১০টি উইকেট দুবার।

হগ ছাড়া অপর দুজন সিম বোলার হলেন ভিক্টোরিয়ার অ্যালান হার্স্ট এবং কুইন্সল্যান্ডের জিওফ ডায়মক। ২৮ বছরের হার্স্ট জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৭৪ সালে এডিলেডে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই পাঁচ বছরে উনি মাত্র দশটি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন। ওঁর দখলে ৪৩টি টেস্ট উইকেট এবং গত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সিডনির চতুর্থ টেস্টে ২৮ রানে ৫ উইকেট ওঁর জীবনের সেরা বোলিং।

বাঁ-হাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ডায়মক হার্স্টের সঙ্গে এডিলেড টেস্টেই প্রথম খেলেন এবং আজ পর্যন্ত আটটি টেস্টে ওঁর সংগ্রহ ২৫টি উইকেট। তেত্রিশ বছরের ডায়মক দলের বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড়। এছাড়া ২৪ বছরের পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অল-রাউন্ডার গ্রেমি পোর্টারও নতুন বলে ভালই বল করেন।

হিউজেসের দলটি ব্যাটিংয়ে বেশ শক্তিশালী। দলের ২১ বছরের দুই কনিষ্ঠ সদস্য, সহ-অধিনায়ক হিলডিচ এবং ডার্লিং ও ২২ বছরের গ্রেমি উড গোড়াপত্তনকারী খেলোয়াড়। নিউ সাউথ ওয়েলসের হিলডিচ এখন পর্যন্ত মাত্র তিনটি টেস্টে খেলার সুযোগ পেয়েছেন এবং রান করেছেন ১৩৯।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রিক ডার্লিং টেস্টে অভিষিক্ত হন ভারতের বিরুদ্ধে এডিলেডের

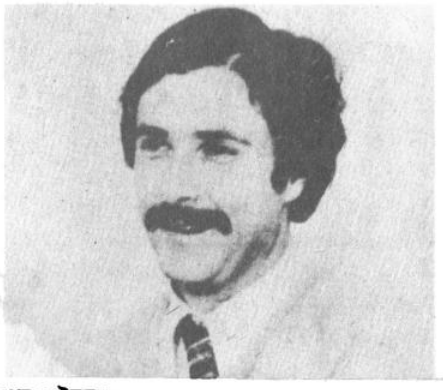

গ্রাহাম ইয়ালপ

রডনি হগ

পঞ্চম টেস্টে ১৯৭৮ সালে। আজ পর্যন্ত নটি টেস্টে ও'র সংগ্রহ ৫৩৯ রান এবং উনি মারমুখী ওপেনার হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিডনির চতুর্থ টেস্টে মাত্র ন রানের জন্য প্রথম সেঞ্চুরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ওটি-ই এখনও পর্যন্ত টেস্টে ওঁর সর্বোচ্চ রান।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার গ্রেমি উডও ঐ এডিলেডেই প্রথম টেস্ট খেলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১২৬ রানের একটি স্মরণীয় ইনিংস সহ ১৩টি টেস্টে ওঁর সংগ্রহ ৮৭০ রান।

অধিনায়ক হিউজেস (পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া), বাঁ-হাতি অ্যালান বর্ডার (নিউ সাউথ ওয়েলস) এবং প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রাহাম ইয়ালপ (ভিক্টোরিয়া) তিনজনই গুণী খেলোয়াড় এবং বড় রকমের ইনিংস উপহার দিতে সক্ষম। তিন নম্বর ব্যাটসম্যানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানটির জন্য অস্ট্রেলিয়াকে কখনও কোনও সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়নি। তেইশ বছরের বর্ডার বেশ ভাল খেলোয়াড়। পাঁচটি টেস্ট খেলেছেন, কিন্তু পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি সহ ইতিমধ্যেই রান করেছেন ৪২২ (গড় ৬০·২৮)।

ছাব্বিশ বছরের ইয়ালপ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অধিনায়ক হিসেবে যথেষ্ট সমালোচনার মুখোমুখি হলেও ব্যাটসম্যান হিসেবে কিন্তু মোটেই ব্যর্থ হননি। টেস্ট খেলেছেন পনেরোটি এবং দলের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি হাজারের বেশি রান করেছেন (১,০৬৫)। ১২১ রানের সর্বোচ্চ ইনিংসটি সহ তিনটি সেঞ্চুরি করেছেন। ইয়ালপ আবার প্রয়োজনে উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। একথা ভেবেই বর্তমান দলটিতে কেভিন রাইট ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উইকেটরক্ষককে নেওয়া হয়নি।

হিউজেস বয়সে ইয়ালপের চেয়ে এক বছরের ছোট, কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, ওঁর মধ্যে সফল অধিনায়কের গুণ আছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১২৯ রানের একটি সেঞ্চুরি সহ ১১টি টেস্টে ওঁর সংগ্রহ ৫২২ রান। ভিক্টোরিয়ার ২৫ বছর বয়সী ডেভ হোয়াটমোরও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন খেলোয়াড়, যদিও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি টেস্টে তিনি মোটেই সুবিধা করতে পারেননি।

উইকেটরক্ষার দায়িত্ব পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কেভিন রাইটের উপর আছে। ছাব্বিশ বছরের এই খেলোয়াড়টি মাত্র চারটি টেস্টে ২২টি উইকেট দখল করেছেন।

ভারতের উইকেট স্পিন বোলারদের সহায়ক হবে ভেবে অস্ট্রেলিয়া স্পিন আক্রমণের উপর যথেষ্ট নজর দিয়েছে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ৩১ বছরের অফ-স্পিনার ইয়ারডলি (১১টি টেস্টে ২৭টি উইকেট), ভিক্টোরিয়ার ২৯ বছরের লেগ-স্পিনার জিমি হিগস (ন'টি টেস্টে ৩৪টি উইকেট) এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার লেগ-স্পিনার পিটার স্লিপকে (একটি মাত্র টেস্টে দুটি উইকেট) দলে নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় নির্বাচকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, এবার যেন কিছু তরুণ খেলোয়াড়কে সুযোগ দেওয়া হয়। বেদী-চন্দ্রদের আঁকড়ে রাখলে আমরা হয়তো দু-একটা টেস্টে জিততে পারি, কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নির্ঘাত আরো অন্ধকার হয়ে যাবে।

মাধ্যমিকে ফার্স্ট অভিজিতের লেখা দুটি নমুনা-উত্তর

বাংলা

প্র: ধূলামন্দির কবিতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। [মাধ্যমিক, '৭৬-৭৭

উ:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ধূলামন্দির" কবিতাটিতে কর্মবিহীন মুক্তিসাধনার স্তর থেকে সৃজনপথের লক্ষ্যে একটি প্রত্যাসন্ন ক্রমোত্তরণ আভাসিত।

সৃষ্টির পথ তখন ছিল পরিত্যক্ত, মানুষের দৃষ্টি ছিল সঙ্কুচিত; বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিল সে সীমাকে, স্বার্থের প্রবর্তনার কাছে পরাজিত হয়েছিল তাদের আত্মপ্রকাশের প্রয়াস, পথ একটানা চলছিল বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না।

সেই সময় মানবের রুদ্ধ মনে বিশ্বমানবচিত্তের উদ্বোধনের আহ্বান এসে পৌঁছোল, গীতার ভাষায় ঘোষিত হল, 'দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়,' খৃষ্টের বাণীতে তারা শুনল, 'বাহ্য বিধিনিষেধে পবিত্রতা নয়, পবিত্রতা আপন অন্তরের নির্মলতায়।'

সেই উপলব্ধির অনুপ্রেরণায় কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটল, অন্তরের দিকে বইল তার ধারা। এই তার আত্মসত্তার বোধ, দৈহিকসত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে দেশে কালে সকল মানুষের ঐক্যের দিকে প্রসারিত। নিখিল মানবের অন্তরের পরিপূর্ণ সংযোগবাহী সেই সর্বজনীন বোধেরই শেষ কথা এই যে, 'যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে এবং অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে।'

পূর্বের থেকে একটা মস্ত বড়ো পার্থক্য দেখা গেল এবার, মানুষ বুঝতে পারে, বহুর মধ্যে সে এক, দেখতে পায়, জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে যতই সে সকলের সাথে যুক্ত হয়, ততই সে সত্য হয়। মানুষ আপনার উন্নতির সাথে সাথে ব্যক্তিসীমা পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠেছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা।

তাই, ভজন, পূজন, সাধন, আরাধনার নিঃসাড় বাহ্যানুষ্ঠানে যেই মানুষ লিপ্ত হয়, তখনই সে খর্ব হয়ে পড়ে। রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে, আচারবিধির নিগড়ে বাঁধা মানুষের জড়ময় ভক্তের পূজায় দেবতা শুধু অনুপস্থিত, শূন্য দেবালয়।

যে দেবতায় মানুষের অসীম চৈতন্যের দ্যোতনা (রবীন্দ্রনাথ যাকে অন্যত্র বলেছেন 'The infinite ideal of Man') সেই দেবতা বেরিয়ে পড়েছেন বাইরে, নিখিলসত্তার ঐক্যবাহী মানবসত্তার সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। কর্মময় জগতের অশান্ত সৃষ্টিতরঙ্গের চঞ্চল অভিঘাতের মাঝে, কৃষকের, শ্রমিকের নিঃস্ব বৃত্তিতে, রৌদ্র-জলে তিনি একাত্ম হয়েছেন সবার সাথে, মর্মর মন্দিরের বাহ্যিক শুচিতার আবরণ পরিহার করে তিনি নিখিল-মানবের অতি কাছে, 'ধূলার 'পরে; 'ধূলামন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত।

যে স্রষ্টা নিজেই তার বিচিত্রমুখী সৃজনের কর্মজালে আবদ্ধ, সৃজনের শৃঙ্খলে সেই বাঁধিয়েই বাঁধা, সৃষ্টির পথেই তার সাথে মিলনের পথ। বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ সেই পথ বেয়ে, সৃষ্টি স্রোতে স্নান করেই তো মানুষ বলতে পারে "সোঽহম্" অর্থাৎ সে তো আমিই!

মানুষ এই প্রথম দেবতাকে তার নিজের মধ্যে অনুভব করল: সৃষ্টির অক্লান্ত প্রয়াসে আর আত্ম-প্রকাশের সীমাহীন প্রত্যাশার অভিব্যক্তিতে।

ইতিহাস

প্র:(ক) অশোকের ধর্মবিজয় নীতি গ্রহণ করার কারণ কি ছিল? (খ) অশোককে 'মহামতি' বলা হয় কেন? যুক্তিসহ তোমার মতামত লেখ। [মাধ্যমিক, '৭৬]

উ:- (ক) সিংহাসন আরোহণের ত্রয়োদশ বর্ষে (২৬০ খৃ: পূ:) মৌর্য সম্রাট অশোক (খৃ: পূ: ২৭৩ – ২৩৬) কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রবল প্রতিবেশী কলিঙ্গ রাজ্য থেকে নিরাপত্তার দিক থেকে সুনিশ্চিত হবার উদ্দেশ্যে অশোক

এই আক্রমণ করেছিলেন, যুদ্ধে অশোক জয়লাভ করেন। এই ভীষণ যুদ্ধে অজস্র রক্তপাত ও লোকক্ষয় হল। প্রায় একলক্ষ (লোক) শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়, আরো কয়েকলক্ষ মারা যায় আনুষঙ্গিক ঘটনাপ্রবাহে। চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন ও মানুষের আর্তনাদ শুনে তাঁর হৃদয় অনুতাপে জ্বলতে লাগল। তিনি যখন বুঝলেন যে, যুদ্ধের পরিণাম এত সাংঘাতিক, তখন প্রতিজ্ঞা করলেন— 'ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ নয়; কারও শোকদুঃখের কারণ হব না; লোভভয় ছেড়ে ধর্মবিজয় করব।" এই উপলব্ধি সম্রাট অশোককে রূপান্তরিত করল ধর্মাশোকে। বৌদ্ধধর্মে তিনি দীক্ষা নিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নির্দেশে। 'ভেরী ঘোষ' (যুদ্ধের বাদ্য) বন্ধ করে ধর্মঘোষ প্রবর্তন করলেন, মানুষের মঙ্গলের জন্য সদাসর্বদা চেষ্টা করতে লাগলেন।

(খ) একান্ত মঙ্গলসাধনই যদি রাজার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি হয়, এবং মানবিকতাই যদি মনুষ্যত্ব-বিচারের মানদণ্ড হয়, তা হলে অশোক শুধু ভারতের কেন, সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট। দেশ-বিদেশের মনীষীরা স্বীকার করেন যে, অশোকের মত সম্রাটের তুলনা মেলে না।

খোলা চিঠি

প্রিয় বন্ধুরা,

আজ কলকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলছি।

কলকাতায় মৃত্যু (১৯৭৩—৭৪)। কলেরায় মৃত্যু ২২০, শ্বাসজনিত রোগে ৪৮১৫।

যক্ষারোগের প্রকোপও কম নয়। মৃত্যু সংখ্যা ঐ বছরে ১০৩৩।

এর অর্থ কি?

প্রথম জলবাহিত অসুখে (যেমন কলেরা) মৃত্যুর সংখ্যা এবং হার কমের দিকে। বিশ বছর আগে হত হাজারেরও বেশী। কিন্তু শ্বাসজনিত অসুখের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা এবং হার বৃদ্ধির দিকে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাঁদের উদ্বেগ, তাঁদের এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। শ্বাসজনিত রোগে বেশী মৃত্যুর কারণ, বাতাসে বিষ ছড়িয়ে পড়ছে।

কলেরায় মৃত্যুর হার কমার একটা কারণ পরিস্রুত জল আজ বেশী পরিমাণে অনেক বেশী এলাকায় পৌঁছচ্ছে। (বলতে ভুলে গিয়েছি, গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৫'র মত। এই অধিক জল সরবরাহ সম্ভব হয়েছে সি, এম, ডি, এ, পলতায় নতুন কতগুলি মেশিন বসিয়েছে বলে, অনেকগুলি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে বলে।

কাজটা থেমে নেই। গার্ডেনরীচ এবং হাওড়ায় দুটি বিরাট জল প্রকল্প তৈরী হচ্ছে। অকল্যান্ড স্কোয়ার এবং সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের ভূগর্ভ জলাধার সমাপ্তপ্রায়। বস্তীতে বস্তীতে জলের কল বসেছে। কলকাতার সমস্যা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা তোমাদের জানা দরকার কারণ, এটা তোমাদেরই শহর।—একজন কলকাতাবাসী

(সি, এম, ডি, এ, কর্তৃক ৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ হইতে প্রচারিত)

এত বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে তিনি এক কথায় লোভ ও যুদ্ধ বর্জন করলেন, যেহেতু মুহূর্তে এত বড় ত্যাগ স্বীকার তাঁকে মহামতির আসনে অভিষিক্ত করেছে, সেই অতীতের, এদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে হিংসায় সুখ নেই; শান্তি ও মৈত্রীতেই জগতের হিত।

অশোক রাজপদকে শাসনবিলাসের যন্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করেন নি, প্রজাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। "সব মুনিসে পজা মমা"— এ কথা সেই দেবানাং-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের পক্ষেই সার্থক। অহিংসা মন্ত্রে সার্থক হয়ে অশোক প্রজার হিত ও জীবের কল্যাণকার্যে নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। সাধারণ মানুষের নীতিশিক্ষার জন্য ধর্মের মূল নীতিগুলো খোদাই করে রেখেছেন গুহায়, পর্বতগাত্রে ও স্তম্ভে; 'রজুক', 'ধর্মমহামাত্র' প্রভৃতি রাজকর্মচারী নিয়োগ করে অশোক প্রজাদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করেছেন। আর পররাষ্ট্রের প্রতি সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের নীতি অনুসরণ করে অশোক যে নৈতিক আদর্শের অনির্বাণ দীপশিখা প্রজ্বলিত করে গেছেন, স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক শান্তির ভিত্তি সেই।

আজ থেকে প্রায় বাইশশত বছরেরও আগে অশোক দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু শুধু ভারত কেন; সমগ্র মানুষ এই সম্রাটের পুণ্যস্মৃতি আজও ভোলে নি। তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য আজ লুপ্ত ও অতীত; কিন্তু পৃথিবীর আদর্শ মহামতি অশোক ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। একহিসেবে অশোক সেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্রাট— সারা বিশ্ব জুড়ে উড়েছে, যাঁর পতাকা — যে পতাকা পশুবলের নয়, ধর্মবিজয়ের। এইচ. জি. ওয়েলস্ বলেছেন; পৃথিবীতে অনেক সম্রাট ও রাজা এসেছেন কিন্তু একমাত্র অশোকই ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল ও ভাস্বর।

অশোকের রাজত্বের দু-শতাধিক বর্ষপূর্বে এক রাজপুত্র শাক্যসিংহ গৃহত্যাগ করেছিলেন; বোধিদ্রুমতলে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন — "অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাম্।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতি॥" আর আজকে, শতাব্দীর ইতিহাসকে মথিত করে, আর-এক রাজপুত্রের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত সেই বাণী তাঁকে মহামতি রূপে চিহ্নিত করেছে।

অভিজিৎ চৌধুরী

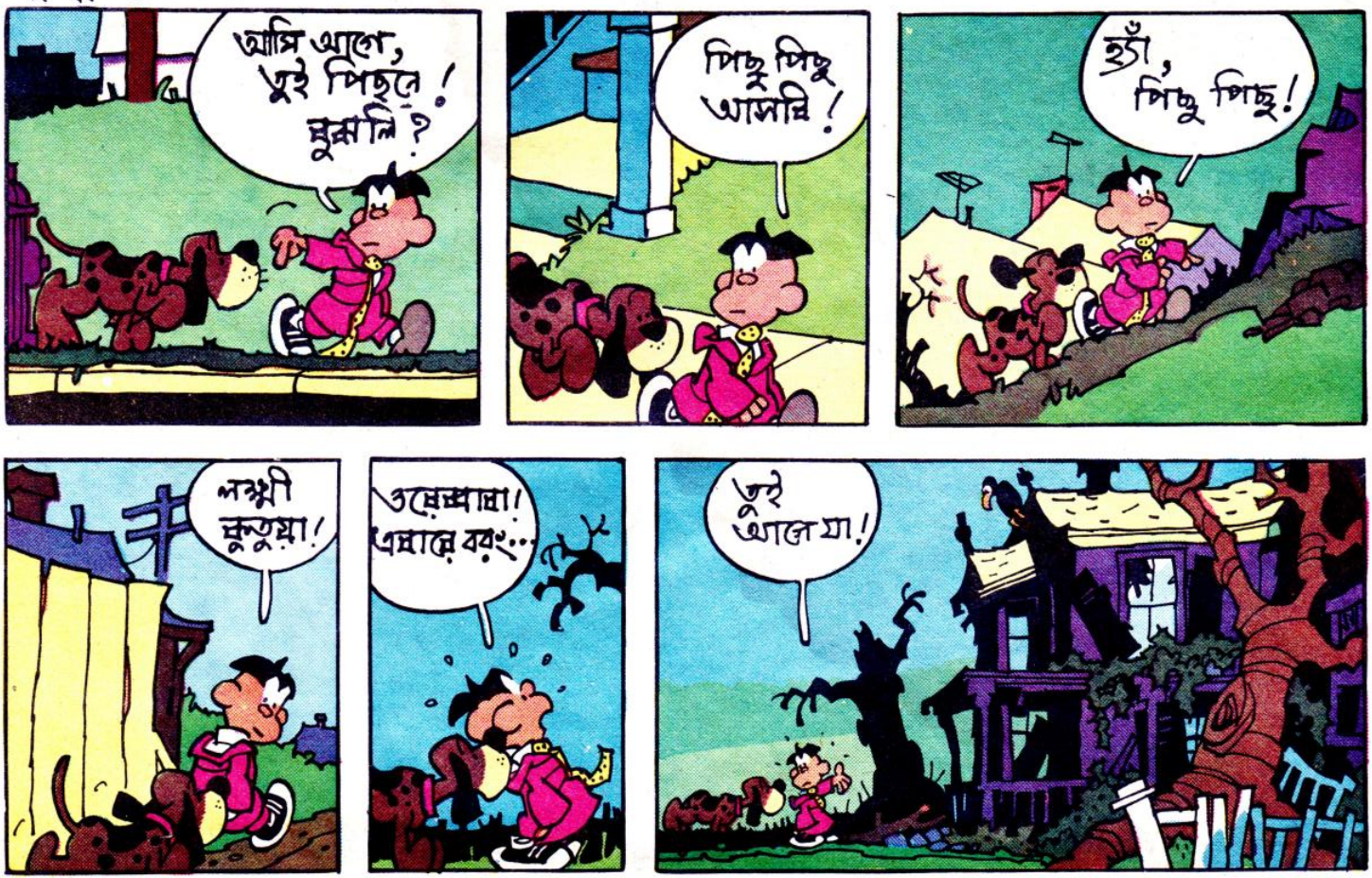

বাঘা ২

গাবলু ২
4-1

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

অভিষেক দাস

আমার দাদাঠাকুর অর্থাৎ ঠাকুরদার বাবা বলতেন, 'পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের সুন্দর ব্যাঘ্রসমাজেরও দিন শেষ হয়েছে।' ভারতের রাজা-মহারাজা আর জমিদাররা ইংরেজদের কাছ থেকে বন্দুক পেয়ে শিকারে মেতে উঠেছিলেন। শিকারির ধড়াচূড়ো পরে ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে সুসজ্জিত হাতির পিঠে চেপে তাঁরা সুন্দরবনে যাতায়াত শুরু করলেন। উদ্দেশ্য, চমকদার বাঘের চামড়ায় ঘরদোর বৈঠকখানা সাজিয়ে আভিজাত্য জাহির করা। কে কটা বাঘ মেরেছে এবং কার ঘরে কতগুলো বাঘছাল আছে—এই পরিসংখ্যান দিয়ে এইসব নব্য শিকারিদের মর্যাদার পরিমাপ করা হত। আর সেই সুবাদে বেচারি বাঘেরাও নামের দিক থেকে এক নতুন সম্মান পেল—'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'।

সুন্দরবন এলাকার এক ছোট্ট গ্রামে ছিল আমার পূর্বপুরুষদের বাস। আমার দাদাঠাকুর সেখানেই জীবন কাটিয়েছেন। তিনি বলতেন, 'বনের বাঘ বনে—এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কী হতে পারে।' আমার বয়স তখন ছয়। মাঠের আলপথ ধরে তাঁর সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে যেতাম। সামনে সবুজ বনের ঝালরে ঢাকা দূরদিগন্ত। বাংলার বাঘের রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে-শুনতে আমি ভয়ে তাঁর হাত চেপে ধরতাম।...

একদিন বড়মার সঙ্গে দাদাঠাকুরের মন কষাকষি হয়েছিল। দাদাঠাকুর রাগ করে রাত্রি-বেলায় বাড়ির খোলা বারান্দায় শুয়েছিলেন। তখন ভরা গ্রীষ্ম। ফুরফুরে বাতাসে তাঁর চোখের পাতায় নেমে এসেছিল গভীর ঘুম। কাকাভোরে ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেন, ডান হাতে এক বাঘের গলা জড়িয়ে শুয়ে আছেন। চিৎকার করতে তাঁর সাহস হল না, আলগোছে নিজের হাতখানা সরিয়ে চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলেন। অনুভব করলেন, বাঘ আলতোভাবে তাঁর কপালটা একটু চেটে বারান্দা থেকে নেমে গেল। দাদাঠাকুর চোখের পাতা খুলে সেই রাজসিক প্রস্থান দেখতে লাগলেন। (গল্পটা দাদাঠাকুরের মুখেই শুনেছি, সত্যিমিথ্যে জানি না।) সেই থেকে তিনি কখনও মাংসাশী প্রাণীদের ভয় পেতেন না। ছোট ছোট নদীর বুকে নির্ভয়ে ডিঙি নৌকা চালিয়ে মাছ ধরতে যেতেন। মাছ যা শিকার করতেন তার বেশির ভাগই বনে ছুঁড়ে দিতেন তাঁর প্রিয় বাঘেদের জলযোগ হিসেবে। উপভোগ করতেন নদীর পাড়ে সকালের নরম রোদে কাচ্চাবাচ্চাদের সঙ্গে বাঘ-বাঘিনীর খেলা।

ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেছে, রাজা-মহারাজারাও অস্ত্রহীন সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছেন, কিন্তু বাঘের উপর অমানবিক আক্রমণ বন্ধ হয়নি। দশ বছর আগেও ভারত সমৃদ্ধ পশ্চিমী দেশগুলিতে ৩,০০০ বাঘছাল রপ্তানি করেছে, বিনিময়ে ওইসব দেশ থেকে পেয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, জঙ্গি বিমান আর যন্ত্রপাতি। গত এক দশকে অথবা কাছাকাছি সময়ে সরকার বাঘশিকার, বাঘের চামড়া বিক্রি এবং রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছেন।

পঞ্চাশ বছর আগেও পৃথিবীতে লাখখানেক বাঘ ছিল, কমতে কমতে এখন পাঁচ হাজারও নেই। এর মধ্যে আবার অর্ধেকেরও বেশি পৃথিবীর বিভিন্ন শৌখিন শহরের চিড়িয়াখানায় বন্দীজীবন যাপন করছে।

সুন্দরবনের কালচে-লাল ডোরাকাটা বাঘ শুধু ব্যাঘ্র-সমাজেই কুলীন নয়, পৃথিবীর

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ও বি-বি-সি'র উদ্যোগে সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের যে-সব ছেলেমেয়ে জয়ী সাব্যস্ত হয়েছে, বাঙালি ছেলে শ্রীমান অভিষেক তাদেরই একজন। তার ইংরেজিতে-লেখা প্রবন্ধ 'দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'-এর সংক্ষেপিত বাংলা তর্জমা এখানে ছাপা হল।

সমস্ত সুদর্শন বন্য প্রাণীদের অন্যতম। এদের হাবভাব রাজসিক। চিড়িয়াখানাতেও তাই বাঘের খাঁচার সামনেই ভিড় ভেঙে পড়ে।

গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঘ্রচর্ম আমদানি নিষিদ্ধ হয়েছে। ভারতে এবং ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা-জাভায় অল্পসংখ্যক বাঘ নিশ্চিহ্ন হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে। বালিদ্বীপ এবং কাস্পিয়ান অঞ্চলের বাঘের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে প্রায় মুছে গেছে। সাইবেরিয়া এবং চীনে কিছু বাঘ হয়তো রয়েছে, কিন্তু তাদের সঠিক সংখ্যা কেউ বলতে পারে না।

আমার এক মাস্টারমশাই একদিন আমায় বলেছিলেন, "ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে পৃথিবী আজ এক সংকটের মুখে। এখন বন্য প্রাণীদের জন্য দরদ দেখানো এক ধরনের বিলাসিতা। বাড়তি মানুষের খাদ্য যোগাতে আমাদের আরও চাষের জমি চাই—এক ইঞ্চি জমিও বন্যপ্রাণীদের জন্য ব্যয় করা উচিত নয়।" তাঁর এই কথার জবাবে আমি, আমার দাদাঠাকুর সুন্দরবনে তাঁর নব্বই বছরের অভিজ্ঞতার নিরিখে যা বলে গেছেন সেই বক্তব্যকে পুঁজি করে, তাঁর সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। আমার যুক্তি ছিল চাষ-আবাদের জন্যে বন কেটে ফেলায় সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় বৃষ্টিপাত উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে, জমি হয়েছে কঠিন, অনুর্বর। আশপাশের লোনা জল সেচের পক্ষে উপযোগী নয়। ফলে, যে-জমি একসময়ে ছিল সুজলা সুফলা, তাতে আজ না ফলে সোনালি ধান, না ফলে পাট। বন যদি বনই থাকত তবে বাঘের বসতি বাড়ত, সঙ্গে-সঙ্গে ফসলও ফলত প্রচুর।

এই অভিজাত বন্যপ্রাণীকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে আমাদের দরকার ১০০০ বর্গমাইলের এক অভয়ারণ্য। ভারত আর বাংলাদেশের ১৫০০ বর্গমাইল জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। এই বনের কিছু অংশ জ্বালানি কাঠ আর ঘরবাড়ি তৈরির মালমশলা সরবরাহ করে। জমিতে এখনও লোকবসতি নেই, চাষবাসও তেমন হয় না। কয়েক বছরের মধ্যে এইসব জায়গায় নতুন গাছপালা জন্মাতে পারে। তাছাড়া, উষ্ণ-আর্দ্র গাঙ্গেয় বদ্বীপে বাঘের খাদ্যেরও অভাব নেই। শান্ত সুন্দরবন বড় বড় বাঘের নিরুপদ্রব বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়া, আরিজোনা, টেক্সাস, ফ্লোরিডা প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে রয়েছে গভীর বন। এইসব জায়গায় 'ব্যাঘ্র-পার্ক' বা অভয়ারণ্য তৈরি করা যেতে পারে।

দূরদর্শন, বেতার, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রচারমাধ্যমগুলি অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে বিবেকবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে, যাতে তাঁরা শুধুমাত্র চামড়ার প্রয়োজনে এমন সুন্দর প্রাণীদের হত্যা না করেন।

নেদারল্যান্ডের প্রিন্স বার্নাডের তত্ত্বাবধানে সারা বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ তহবিল খোলা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, পশ্চিম জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট জুলজিক্যাল সোসাইটি ডেভিড স্মিথের নেতৃত্বে অভয়ারণ্য এবং ন্যাশনাল পার্ক তৈরির উদ্দেশ্যে এক ফান্ড খুলেছেন। এঁরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে ভারত সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। সুন্দরবনের অরক্ষিত জমি নদনদীসমৃদ্ধ। নদীগুলি অরণ্যকে জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। গাছপালা লাগিয়ে ব্যবধান আরও বাড়ানো যেতে পারে। বনরক্ষীদের সদাসতর্ক থাকতে হবে যাতে বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে অনুপ্রবেশ না করতে পারে। গুজরাতের গির অরণ্য আর নেপালের চিতাবন ন্যাশনাল পার্ক দুটি আদর্শ উদাহরণ।

বাঘ ভারতের জাতীয় পশু এবং আমরা ভারতবাসীরা এজন্য গর্বিত—সবশেষে এটুকু না বললে এ-লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ফুলের রানী

নেড়া মাথায় চটপোড়া দিয়ে টুম্পির মাথায় ঘন হয়ে গজিয়েছে কচি কচি চুল। সেই চুলে হেমন্তিকাদি আটকিয়ে দিয়েছে বোগেনভিলিয়া কয়েকটা ছোট্ট ডাল।

পুকুরের জলে নিজের মুখটা দেখে টুম্পি খুব সুন্দর করে হেসে বলল, "আমি যেন ঠিক ফুলের রানী, তাই না?" তা হলুদ, গোলাপি আর বেগনে বোগেনভিলিয়া বাহারে টুম্পিকে যেন ফুলের রানীই মনে হচ্ছিল; যদিও ওর পিসি মানে ভাস্বতীদি খুব রেগে গিয়ে বলল, "এরকম উৎকট সাজলে তোমাকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব না। পথেই কুমোর-টুলির গরুরা তোমাকে খেয়ে ফেলবে।" আর আমাদের বলে দিল, "তোরা ওকে টুম্পি না ডেকে 'মিস্ ঝোপঝাড়' বলে ডাকিস।" অবশ্য টুম্পি পিসির কথায় কর্ণপাত করল না, আমরাও না।

হেমন্তিকাদি আরও কয়েকটা ছোট্ট ডাল গুঁজে দিল ওর হেয়ারক্লিপে।

বড়রা যখন রান্না নিয়ে ব্যস্ত, ছোটদের ইচ্ছে হল বাগানের মধ্যে বিরাট বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে। কিন্তু শোনা গেল, ওটা ভূতের বাড়ি। ব্যস্, অনেকেই গেল পিছিয়ে। কিন্তু টুম্পি তো প্রায়ই ভূত দেখে; কাল রাতেই ও যখন পড়ছিল ওর ঘাড়ের কাছে একটা ভূত এসে দাঁড়িয়েছিল। ও তাই ভূতকে তেমন পছন্দ না করলেও ভয়ও পায় না। ও সবার আগে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে, পিছনে অন্য সকলে। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। জমকালো রেলিং জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। দোতলার বারান্দা অতজনের পায়ের ভারে কেঁপে উঠল থরথর করে। তারপরে সবাই পৌঁছল একটা বিরাট হলঘরে।

মনু বলল, "জমিদারবাবুদের আমলে এখানে নাচ-গান হত। এখনও রাত্রিবেলা কারা যেন নাচে, ঘুঙুরের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় কেয়ারটেকারের।" আমরা সেই নাচ দেখলাম না, কিন্তু 'ফুলের রানী'ই আমাদের নেচে দেখাল মনুর ট্রানজিস্টরের গানের তালে তালে।

সারাটা দিন কেটে গেল হৈহুল্লোড় করে। সন্ধেবেলা একটা বিরাট ভ্যানে চড়ে আমরা রওনা হলাম শমিতাদির বরানগরের বাগান-বাড়ি থেকে শ্যামবাজারের দিকে। শ্যাম-বাজারের মোড়ে নামল ভাস্বতীদি বুবাইকে নিয়ে। কাছেই ওদের বাড়ি। কিন্তু টুম্পি আর কিছুতেই নামে না রাগ করে।

শেষকালে এক ছড়া কলা হাতে নিয়ে চার-দিকে বোগেনভিলিয়া শুকনো পাতা ঝরিয়ে 'ফুলের রানী' গম্ভীরমুখে নেমে গেল গাড়ি থেকে পিসির হাত ধরে।

রাজকন্যা চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১৪)

তখন ছিংহ এসে

যখন আমি কলকাতায় লাড্ডুকাকুর বাড়িতে নিনি* করছিলাম, তখন একটা ছিংহ এসে আমাকে হালুম করল। আমি উঠে বন্দুক দিয়ে গুলি করে দিলাম। ছিংহটা মরে গেল।

থিম্পু (বয়স ৩)

* থিম্পু 'ঘুম'কে 'নিনি' বলে।

পিঁপড়েদের লড়াই

সুমন একটা পিঁপড়ের দলকে ডিঙিয়ে চলে গেল। লাইনের বাইরে বেরিয়ে থাকা কয়েকটা পিঁপড়ে মারা গেল সুমনের পায়ের চাপে। পিঁপড়েদের সর্দার পিঁপড়েদের ডেকে বলল, "ভাইসব! মানুষরা আমাদের তুচ্ছ মনে করে। এসো আমাদের হুল দিয়ে মানুষদের বুঝিয়ে দিই যে, আমরাও বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করি।"

সর্দারের মুখ থেকে এই কথা বের হওয়া মাত্র পিঁপড়েদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। পিঁপড়ের দল বীরের মতো সুমনের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কটকট করে কামড়াতে লাগল। সুমন অস্থির হয়ে পা ঝাড়তে লাগল ক্রমাগত।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পরে সুমন দেখল তার কানে টান পড়ছে। সে চোখ খুলে দেখে মা। সে মাকে বলল, "মা আমার পা দুটো খুব ফুলেছে?" মা ওর দুই পা দেখে বলল "কই না তো, একটুও ফোলেনি।" সুমন হো-হো করে হেসে বলল, তবে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১৩)

'জোনায় কিছুক্ষণ' লেখাটি ১ অগস্ট ও ১৫ অগস্ট, পরপর দুটি সংখ্যাতেই বেরিয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

ছবি এঁকেছে ঊর্মিলা জানা (বয়স ১৩)

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিঁড়ি

ঘরবাড়ি আঁকায় সিঁড়ির দরকার সব সময়। সহজে সিঁড়ি আঁকার নমুনা দেখ। প্রথম ছবিতে কেবল ধাপ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ধাপের ওপরের অংশ দেখা যাচ্ছে না (১নং ছবি)। কেবল কয়েকটি বাড়তি রেখার (লাল) টানে একই সিঁড়ির ধাপের ওপরের খানিকটা অংশ অনায়াসেই দেখা যাচ্ছে (২নং ছবি)। একটু রেখার হেরফেরে নানানভাবে সিঁড়িকে তার ধাপসমেত দেখা আর আঁকা খুব সোজা।

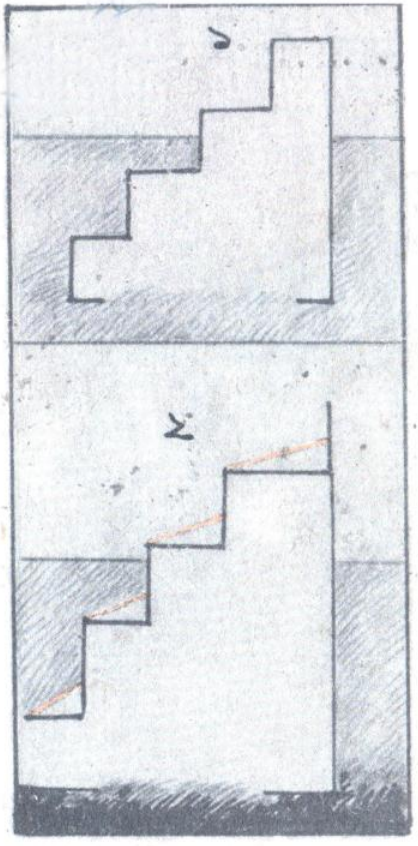

কারিগর

বাঁশের কাজ ঃ টেবিল ম্যাট

জোগাড় করা জিনিস দিয়েই শুরু করো। ম্যাটের জন্যে পাতলা বাঁশের পাতি কেটে, জলে ভিজিয়ে গরম করে, আরও চেঁছে পাতলা করলে প্লেয় কাগজের মতো হয়ে যাবে। এবার মাপ-মাফিক আড়াআড়িভাবে একটা পাতিকে রেখে তার ওপর লম্বাভাবে পরপর সমানভাবে তোমার দরকার মতো পাতি সাজিয়ে (১ নং ছবি) সেগুলোকে রঙিন সুতো (শক্ত) দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দাও। এবার আলাদা পাতি নিয়ে ওপর-নীচে করে চালিয়ে যাও পর-পর তোমার প্রয়োজন মতো। (২ নং ছবি) এই ভাবে করলে দেখবে তোমার মাপ-মাফিক ম্যা ধীরে ধীরে তার আকার নিচ্ছে।

জেনে রাখো—(১) পাতিকে নানান রঙে ছুপিয়ে নিলে কাজে বাহার আসবে। (২) ম্যাটের বোনা শেষ হলে চারপাশ রঙিন ফিতে দিয়ে সেলাই করে মুড়ে নাও। বোনার সময় পাতিগুলোকে ভা করে ঠেলে না দিলে আলগা থেকে যাবে।

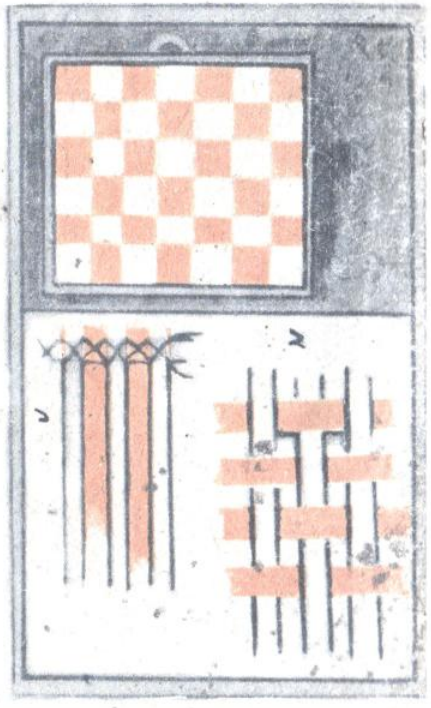

জেমসের মজার আসর

১০০১টি পুরস্কার জিতে নাও!

যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি ?

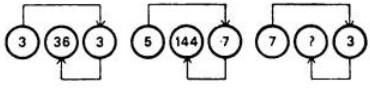

তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি বড় (৩০ গ্রামের) প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে, তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।

এই ঠিকানায় পাঠাওঃ "Fun with Gems" Dept. No. D22
Post Box No. 56, Thane 400 601. Maharashtra.

রঙ-বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস্

CHAITRA-C-263 BEN

রাম শ্যাম আর সার্কাসের জোকার রাজন

খেতে ভাল দেখতে ভাল
ভাবতে ভাল
পার্লে
পপিন্স
মিষ্টি কলার পার্লে পপিন্স

৫ রকম ফলের স্বাদে
ভরপুর— রাসবেরী, আনারস, লেবু,
কমলালেবু ও মুসম্বী।

everest/78/P